টার্জান ফাইটস্ ফর লাইফ

সব্যসাচী
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড,
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

আগস্ট
১৯৬১

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯
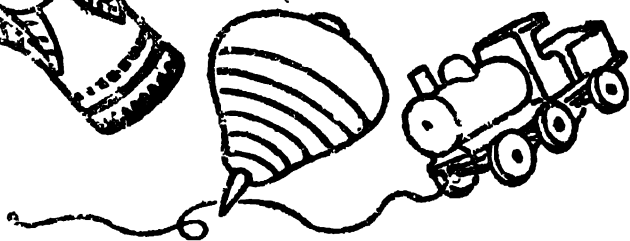
উপহার

সব্যসাচী

প্রণীত

টার্জান ফাইটস্ ফর লাইফ

পেরুর অরণ্যে টার্জান

'কু-কু'

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো সে, কেউ কোথাও নেই। আবার সে আপন মনে চলতে থাকে।

আবার—

'কু-কু'

নাঃ, বাব বার এরকম একটা শব্দ আসছে, অথচ কোথেকে সেটা আসছে, তা জানতে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আবাব সে তাকালো চাবদিকে, কিন্তু 'কু-কু' শব্দ কববার মতো কোনো পাখিই তো কোনদিকে দেখা যাচ্ছে না। সে এবাব তাকালো উপর দিকে, কিন্তু—

'কু-কু'

আবার এলো শব্দটা। মনে হলো সামনেব ঝোপটার ভিতরেই বুঝি পাখিটা লুকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে চুপি চুপি এগুতে লাগলো সে, আর এমন সময় কে এসে চট করে পেছন থেকে তার চোখ টিপে ধরলো।

বাঃ রে, এ যে জ্বালাতন! শহর বন্দর ছেড়ে মানুষের সঙ্গ এড়ানোর জন্যে সে চলে এসেছে নির্জন পাহাড়ে, এর মধ্যেও আবার ঝকমারি! চোখ টিপে ধরে কে?

চট করে ঘুরে গিয়ে দু'হাতে তাকে মাথার উপর তুলে ধরলো

আছাড় দেবে বলে। কিন্তু উপর থেকে নারীকণ্ঠে শোনা গেলো চিৎকার ঃ

'ওরে বাবা, মরে যাবো যে,—নামিয়ে দাও স্মিথ– এত ঠাট্টা ভালো লাগে না।'

নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে অবাক্ হলো সে,—আর ছুঁড়ে না দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলো সামনে।

নারী আর পুরুষ—দু'জনে দাঁড়ালো মুখোমুখী, দু'জনের মুখেই অপার বিস্ময়ের চিহ্ন।

নারী বললো, 'ওফ! স্যরি, আমি ভেবেছিলাম তুমি স্মিথ '

পুরুষ বললো, 'না, আমি স্মিথ নই, আমি টার্জান। কিন্তু তোমার এই স্মিথটি কে, কোথায় সে? আর তুমিই বা কে?'

মেয়েটি বললো, 'আমি হচ্ছি হান্না, আর স্মিথকে চেনো না? গুঁফো স্মিথ?'

বলে সে নিজেই ফিক করে হেসে উঠলো। তারপর আবার বললো সে, 'মেজর স্মিথের ছেলে এই জুনিয়র স্মিথ। আমরা সবাই গাড়ি নিয়ে এসেছি এখানে। পাহাড়ের নীচেই আমাদের তাঁবু পড়েছে—ক'দিন এখানে ঘোরাফেরা করে আমরা আবার ফিরে যাবো। কিন্তু তুমি কে? এখানে কেন?'

এবার টার্জানের কথা বলার পালা। সে বললো, 'আমার একমাত্র পরিচয়, আমি টার্জান। এ ছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই। আর আমি এখানে এসেছি কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই! বরং বলা চলে, মানুষের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তোমরা, মানুষরা,

এখানেও এসে হানা দিয়েছো ; সুতরাং আর আমি এখানে থাকবো না।'

টার্জানের কথা শুনে অবাক্ হলো হান্না। কিন্তু অবাক্ হলেও সে হার মানবার পাত্রী নয়। তাই সে টার্জানকে বললো, 'যখন যেখানে যাবার, তখন তুমি সেখানে যেয়ো ; কিন্তু আপাতত আমার সঙ্গে এসো। স্মিথকে খুঁজে বার করতে হবে না ?'

এবার অবাক্ হলো টার্জান। স্মিথকে খুঁজে বার করবার তার কোন দায়িত্ব নেই। সে কেন এই অপরিচিতা নারীর সঙ্গে খুঁজতে যাবে অচেনা স্মিথকে। তাই সে বললো, 'স্মিথকে খুঁজতে আমি যাবো কেন ? আমার কি দায় পড়েছে ?'

কিন্তু একথা বলেও মুখরা হান্নাকে দমানো গেল না। সে বললো, হ্যাঁ, তোমারই তো দায় ! ভুল বুঝে তোমার পেছনে ঘুরেই তো আমি আসল স্মিথকে হারালাম। তুমি এখানে না এলে তো আর আমার এই হয়রানি হতো না। অতএব, তুমিও আমার সঙ্গে থেকে ওকে খুঁজে বার করবে।'

এই বলে হান্না টার্জানের হাত ধরে টানতে লাগলো। অপরিচিতা নারীর এই বেপরোয়া ভাবটুকু টার্জানের বড় মন্দ লাগলো না। সে বললো, 'বেশ, চলো কোথায় স্মিথ,—তাকে খুঁজে বার করি।'

এই বলে দু'জনে বেরিয়ে পড়লো স্মিথের সন্ধানে।

লুকোচুরি খেলতে গিয়েই স্মিথ হান্নার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তারপর পথ ভুলে গেলো। সে যতই এগুতে চাইছে, উলটো পথ ধরে ততই সে দূরে সরে গেলো।

যখন তার মনে হলো যে সে তাদের তাঁবু থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, তখন সে চেঁচিয়ে ডাকলো হান্নাকে, কিন্তু সে ডাকে হান্নার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ বাদে স্মিথ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলো। ভাবলো গুলির আওয়াজ শুনে হান্নাও হয়তো আবার গুলির আওয়াজ করে তাকে পথের সন্ধান দিতে পারে কিন্তু স্মিথের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। কারণ বাতাসের গতি উলটোমুখী ছিল বলে হান্না তাও শুনতে পেলো না।

কিন্তু বিপদ ডেকে আনলো ওই বন্দুকের আওয়াজই। অপ্রত্যাশিত ওই শব্দে চমকে গিয়ে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একজোড়া ভালুক। তারপর বাইরে এসে যখন অচেনা এক জীবকে দেখতে পেলো, তখন তাকে করলো তাড়া।

স্মিথের আর তখন বন্দুকে গুলি পুরে তাক্ করবার সময় কিংবা মন কোনটাই ছিল না—সে পড়ি কি মরি কবে সোজা দিল দৌড়।

স্মিথ এক একবার পিছন ফিরে তাকায় আর সামনের দিকে দৌড়ায়। শেষে পথে পেলো একটা বিরাট গাছ। ভাবনা চিন্তা না করেই সে তরতর করে চড়ে বসলো গাছে। ভালুকও যে বৃক্ষ-আরোহণে সুপটু, সে খেয়াল আর তার ছিল না।

তাই স্মিথ যে মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হয়ে গাছে বসে হাঁপ ছাড়ছে, সেই মুহূর্তে সে দেখতে পেলো, একটা ভালুকও অনায়াসে সেই গাছটায় উঠে আসছে।

এই মুহূর্তে সে বন্দুক নিয়ে ভালুকটাকে গুলি করতে পারতো, কিন্তু গাছে চড়বার সময় সে বন্দুকটাকে গাছের গোড়ায় ঠেস

দিয়ে রেখে এসেছিল—কাজেই এইবার বুঝি ভালুকের হাতে আত্মসমর্পণ কবা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

স্মিথ দু' একবাব গাছের ডাল ভেঙে ভালুকটাকে তাড়া দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হলো না। তখন সে এডাল-ওডাল করতে লাগলো। ভালুকটাও তার পিছন পিছন ঘুরছে। এ যেন এক লুকোচুরি খেলা।

বুঝি খানিক অবসব পেয়ে স্মিথের মাথায় বুদ্ধি এসে গিয়েছিল। সে একটা ঝুবি ধবে তরতব কবে নীচেব দিকে নেমে আসতে লাগলো। আর যাই হোক—ভালুকটা এই ঝুবি বেয়ে নীচে নামতে পাববে না।

খানিকটা নীচে এসেই স্মিথ দেখলো, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে জোড়ার ভালুকটা। এটার কথা স্মিথ একেবাবে ভুলেই গিয়েছিল।

এইবার নিজের ফাঁদেই নিজে আটকা পড়লো স্মিথ। সে আর মাটিতেও নামতে পাবছে না, গাছেও চড়তে পারছে না—ঝুরি ধরে শূন্যে ঝুলতে লাগলো, আর চেঁচাতে লাগলো।

এদিকে স্মিথকে খুঁজতে খুঁজতে টার্জান আব হান্না ভাগ্যক্রমে এইদিকেই আসছিল—তারা স্মিথেব চিৎকার শুনতে পেয়ে এই দিকেই ছুটে আসছিল। এসে যা দেখলো, তাতে হান্নার তো চক্ষুস্থির। গাছের ঝুরি ধরে শূন্যে ঝুলছে স্মিথ আর নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভালুক। ভাগ্যিস গাছের ওপরের ভালুকটা তখনও তার চোখে পড়েনি।

হান্নাই গুলি ছুঁড়লো—ভাগ্যক্রমে সেই গুলি ভালুকটার গায়েই লেগেছিল, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সেটা।

হান্না ডেকে বললো স্মিথকে, 'নেমে এসো স্মিথ।'

কিন্তু ঝুরি বেয়ে নামবার কিংবা উঠবার অবস্থা নেই আর স্মিথের। সে ধরা গলায় বললো, 'কিন্তু আমি যে নামতে পারছিনে।'

টার্জান ছুটে গেল তার কাছে। তারপর ডেকে বললো স্মিথকে, 'এই গুঁফো, ঝাঁপিয়ে পড়ো, ছেড়ে দাও হাত-পা।'

একথা বলতে বলতেই ওপর থেকে টার্জানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—না, গুঁফো স্মিথ নয়, রোঁয়াওলা সেই ভালুকটা।

এর জন্যে অবিশ্যি টার্জান মোটেই তৈরী ছিলো না। তাই প্রথমটায় সে কতকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও মুহূর্তেই সে সামলে নিলো। ভালুক আর টার্জানে শুরু হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

ওদিক থেকে হান্না চেঁচাচ্ছে, 'টার্জান, তুমি সরে যাও, আমি ভালুকটাকে গুলি করছি।'

বেচারী জানে না যে টার্জান ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়ে থাকতে চাইলেও কম্বলটা ওকে ছাড়বে না। কাজেই হান্নার চেঁচানো আর সাবধানবাণী দুইই ব্যর্থ হলো।

অবিশ্যি টার্জানের জন্যে কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তবে নেহাত আচমকা আক্রান্ত হওয়াতেই প্রথমটা সে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো।

খানিক বাদেই সে ভালুকটাকে বাগিয়ে ধরে হান্নাকে ডেকে বললো, 'এই হান্না, তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে এই ভালুকটাকে গুলি করো—ভয় পাবার কিছু নেই। নয়তো একখানা ছোরা ছুঁড়ে দাও।'

অবিশ্যি ভয় পাবার মেয়ে হান্নাও নয়; তাহলে আর এই দুর্গম বনে একলা চরে বেড়াবার সাহস তার হতো না।

অতএব নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে এলো হান্না। তারপর ভালুকটার কপাল সই করে করলো গুলি।

এইবার মরা ভালুকটাকে ছেড়ে দিয়ে টার্জান হাত পেতে দাঁড়ালো স্মিথের নীচে। তারপর পাকা আমটির মতোই টুপ করে স্মিথ পড়ে গেলো একেবারে টার্জানের কোলে।

এরপরে স্মিথ যা করলো, তাতে অবাক্ হলো টার্জান আর হান্না দু'জনেই। এক ঝাপটায় টার্জানের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স্মিথ হনহন করে ছুটতে লাগলো—না তাকালো সে হান্নার দিকে, না বললো সে একটা কথা, না দিলো সে একটা ধন্যবাদ।

খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে টার্জান বুঝলো: ওই গুঁফো স্মিথ তাকে অপমান করেছে। এই বুঝেই সে ছুটলো তার পিছু পিছু। খানিক বাদেই সে স্মিথকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এলো হান্নার কাছে। তারপর বললো, 'শোন গুঁফো – আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি আর তুমি আমাকে অপমান করেছো।—তোমাদের ভদ্র-সমাজে এর শাস্তি কি জান?'

স্মিথ কোন কথা বলে না, সে মুখ বুজে ঘাড় নীচু করে বসে রইলো। হান্না তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে চুপি চুপি বললো, 'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, ওই ভদ্রলোকই আজ আমাদের বাঁচিয়েছে—ওকে অপমান কোরো না। ও একজন ভবঘুরে লোক, কাজেই তোমার কোন ভয় নেই।'

টার্জান কিন্তু দস্তুরমতো চটে গেছে। সে বললো, 'ঘাড় তুলে দাঁড়াও গুঁফো—নইলে তেতো ফলটির মতই তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

টার্জানের যে শক্তি আব মেজাজের পরিচয় স্মিথ পেয়েছে, তাতে তার মনে হলো, সত্যি সত্যি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া টার্জানেব পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই সে মুখ তুলে দাঁড়ালো—কিন্তু তেমনি গোমড়া মুখ করেই রইলো।

টার্জান বললো, 'শোন গুঁফো! সমাজ-সংসারেব প্রতি আমার কোন লোভ নেই, তোমাদেব বন্ধুত্বেব জন্যেও আমার কোন গরজ নেই। এই মেয়েটা অনর্থক আমাব পেছনে লেগেছিল বলেই দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। যাকগে, আব ভাবনা ভেবো না—আমি চলে যাচ্ছি, আর কখনো তোমাদেব সঙ্গে দেখা হবে না।'

জিজ্ঞেস করলো হান্না, 'কিন্তু যাবে কোথায় তুমি?'

টার্জান বললো, 'যেখানে মানুষ নেই, অন্তত তোমাদের মতো মানুষ নেই, যাচ্ছি সেই অরণ্যে—একেবারে বুনো পশুদের মাঝখানে। টা-টা—'

বলেই ওদের দিকে পিছন ফিরে চলতে শুরু করলো টার্জান।

টার্জানকে এমন নিস্পৃহভাবে চলে যেতে দেখে স্মিথেরও চৈতন্য জাগছিল, আব হান্নার সকাতর অনুরোধও ঠেলতে না পেরে স্মিথ হান্নার সঙ্গে সঙ্গে চললো টার্জানকে ফিরিয়ে আনতে।

কিন্তু টার্জানেরও বুনো গোঁ—কিছুতেই সে ফিরবে না। শেষটায় হান্না যখন তার হাত ধরে টানতে লাগলো, তখন টার্জান ফিরে না এসে

আর পারলো না। তবে বললো, 'কিন্তু তোমার তাঁবুর লোকদের একবার দেখা দিয়েই আমি চলে আসবো—তখন আর বাগড়া দিয়ো না কিন্তু।'

তারা পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে আসছে, হয়তো তাঁবুও আর খুব বেশী দূরে নয়, এমন সময় শোনা গেল,—

ডুম, ডুম, ডুম-—

একটানা শব্দ। শব্দ শুনেই চমকে উঠলো হান্না, চমকে উঠলো স্মিথ, চমকালো টার্জানও। এই বাজনার সঙ্গে এরা সকলেই পরিচিত। বুনোরা যখন যুদ্ধজয় করে ফিরে আসে তখনই এই বাজনা বাজায়।

হান্না বললো, 'টার্জান! কী হবে!'

অবাক্ হলো টার্জান। সে বললো, 'কেন,—আমরা তো অনায়াসে এদের পাশ কেটে বেরিয়ে যেতে পারি, তবে ভাবনাটা কিসের?'

হান্না তাকে দেখালো, সে যা ভাবছে তা হবার নয়। তাদের রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে খালের মতো নীচু—পাশ কাটানোর পথ নেই। এখন এক পিছন ফিরে আবার পাহাড়ে যাওয়া যায়, নইলে ওদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে লড়তে হয়। কিন্তু কোনটাই খুব আরামদায়ক নয়। তাই ভয়ে স্মিথ আর হান্নার মুখ কালো হয়ে গেলো।

তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে টার্জান আর কিছু বললো না; সে শুধু মুখের সামনে হাত দু'খানা নিয়ে বিকট এক আওয়াজ করলো। সেই আওয়াজে চমকে উঠলো হান্না আর স্মিথ দু'জনেই।

তাদের মনে হলো—একদল হাতি যেন তাদের পিছনে তাড়া করছে।

টার্জান বার কয়েক ওরকম শব্দ করতেই বুনোদের বাজনা থেমে গেল। তারপর ঢাকের মুখে নতুন যে বোল ফুটে উঠলো, তাতে তারা বুঝলো যে ভয় পেয়ে বুনোরা পালাচ্ছে। স্মিথ আর হান্নার মুখে হাসি ফুটে উঠলো—বিস্ময়ের চিহ্নও সেই সঙ্গে।

টার্জান কোন কথা বলল না; তাদের সঙ্গে নীচে নেমে এলো। বুনোদের বাজনা মিলিয়ে গেলো দূর থেকে আরও দূরে।

নীচে নেমেই চিৎকার করে উঠলো স্মিথ, 'এ কি? আমাদের তাঁর কোথায় গেল? লোকজন?—শুধু যে গাড়িটাই পড়ে আছে দেখছি!'

ছদ্মবেশে টার্জান

ওদের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো টার্জানও। সে যে অকস্মাৎ এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়বে, সেকথা কি সে নিজেই চিন্তা করেছিল? তাই থ' হয়ে বসে রইলো সেও। কিই বা সান্ত্বনা দেবে তাদের এসময়!

স্মিথ আর হান্না—তারা দু'জনেই প্রথম এবং এমন অপ্রত্যাশিত আঘাতে কাতর হয়ে পড়লেও আসলে বাস্তববুদ্ধি দু'জনেরই ছিল যথেষ্ট। তাই কতক্ষণ পরেই তাদের সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা আবার মাথা তুললো।

অসহায়ের মতো টার্জানের দিকে তাকিয়ে হান্না বললো, 'এখন কি করা যায় বলতো? এমন গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে তো অবস্থার কোন প্রতিকার হবে না। আমরা দু'জনেই শোকগ্রস্ত, কাজেই তোমার বুদ্ধি আর কর্মক্ষমতার উপরই আমরা নির্ভর করছি—এখন পথের সন্ধান তুমিই দেখাবে।'

টার্জান বললো, 'ব্যাপার দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বুনোর দল আচমকা ক্যাপ্টেন স্মিথের দলকে আক্রমণ এবং বিভ্রান্ত করে দিয়ে তাঁদের বন্দী করেছে। তারপর যেগুলোকে দরকারী মনে করেছে সেগুলোকে লুঠ করে নিয়েছে, তাই ছ্যাখো কিছু কিছু জিনিসপত্র এখানে ছড়ানো রয়েছে। মোটরটার কোন উপযোগিতা না বুঝে ওটাকে ওখানেই ফেলে রেখে গেছে।'

টার্জানের কথা স্বীকার করে নিয়ে স্মিথ বললো, 'তোমার অনুমান অভ্রান্ত। কিন্তু বুনোর দল কোথায় ওঁদের লুকিয়ে রেখেছে তার হদিস পাবো কি করে তাই বলো।'

টার্জান বললো, 'আমরা যখন পাহাড় থেকে নেমে আসছি, তখন মনে হয় ওরা এদিকেই আসছিল। তাই আমার ধারণা—এই পথ দিয়ে যদি যাই, তবেই হয়তো ওঁদের দেখা পেতে পারি।'

স্মিথ বললো, 'হয়তো তোমার এ অনুমানই সত্যি, কিন্তু কথা হলো সেখানে গিয়ে পৌঁছবো কী করে, আর গিয়ে পৌঁছুলেই বা তাঁদের উদ্ধার করবো কী করে?'

এটাও অবশ্য ভাবনার কথাই। কিন্তু তা বলে টার্জান কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে বললো, 'সে চিন্তা পরে

করা যাবে। আগে তো তাদের সন্ধান করা যাক—উপায় তখন একটা কিছু হবেই।'

টার্জান নিজের শক্তি এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলেই হতাশ হয়ে পড়েনি। কিন্তু স্মিথ আর হান্না অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিল,—তাই তারা টার্জানের উৎসাহ দেখেও নিজেরা উৎসাহিত হতে পারছিল না। তৎসত্ত্বেও টার্জানের মতে মত দেওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায়ও ছিল না।

হান্নার মনে আবার প্রশ্ন জাগলো: দৈবক্রমে যখন মোটরটা পাওয়া গেছে তখন এই নির্বান্ধব অপরিচিত অরণ্যপ্রায় অঞ্চলে এটাকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে কি? এটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে না। আবার এর জন্যে কোন পাহারাদার রাখাও সম্ভব নয়। এই ভাবনা ভেবে হান্না বললো, 'কিন্তু গাড়িটার কি ব্যবস্থা হবে? যা গেছে, তাতো গেছেই কিন্তু যা আছে, সেটা ফেলে দেওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

স্মিথ বললো, 'তুমি ভালো কথাই মনে করেছো। আমি গাড়িটাকে ভালো করে বন্ধ করে যাচ্ছি—যাতে আমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ এর কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

এই বলে স্মিথ গেলো গাড়িটার কাছে, গিয়েই সে চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে হান্না আর টার্জান দু'জনেই ছুটে গেলো গাড়ির দিকে।

তারা গিয়ে দেখলো, গাড়ির মধ্যে শুয়ে ভোঁসভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছে একটা লোক। লোকটার গায়ের রং লালচে—সারা দেহে
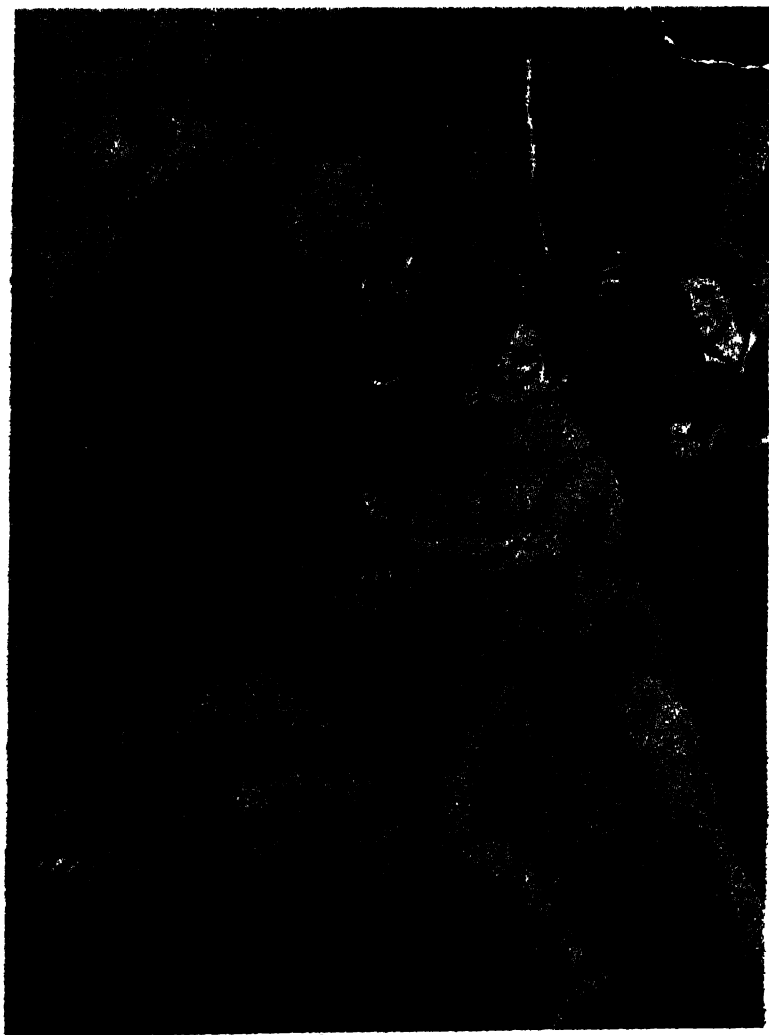
ভালুক আর টার্জানে শুরু হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ

উলকি আঁকা, আর পরিধানে চামড়ার পোশাক। মাথায় পালকের টোপরটি তার খসে পড়েছে।

টার্জান প্রায় সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু এমন ধরনের বুনো এর আগে তার চোখেও পড়েনি—তাই একে দেখে সে হতবাক্ হলো।

টার্জান ডেকে জাগালো লোকটাকে—লোকটা জেগে উঠে হকচকিয়ে গেলো তারপর সামলে নিয়ে সে কোমর থেকে ছোরা বার করতে যেতেই টার্জান তার হাত চেপে ধরে তাকে টেনে বার করলো গাড়ি থেকে।

টার্জানের হাতে পড়ে লোকটার বলবীর্য যেন কোথায় উবে গেল। টার্জান তাকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝালো যে জোর দেখিয়ে এখানে কোন লাভ হবে না। মনে হলো, লোকটা যেন টার্জানের ইচ্ছা বুঝতে পেরেছে, তাই সে শান্ত হয়ে গেলো।

টার্জান স্মিথকে বললো, 'এটাকে পেয়ে ভালই হলো, একে নিয়েই যাবো এদের পাড়ায়। পথ খোঁজার হাঙ্গামা থেকে বাঁচা গেলো।'

টার্জানের কথায় অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো স্মিথ, 'কিন্তু এর কথা না বুঝলে কী করে ওর সঙ্গে কথা বলবে?'

টার্জান জানালো যে দীর্ঘকাল বনে-জঙ্গলে থাকায় সে আভাসে ইঙ্গিতে বুনোদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারে। অতএব এর সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা সে অনায়াসেই করে নিতে পারবে।

খুশী হয়ে স্মিথ মোটর বন্ধ করতে গেলো। হান্না টার্জানের গুণপনা দেখে আরও মুগ্ধ হলো।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু টার্জানের মত পালটে গেলো। সে স্থির করলো যে স্মিথ আর হান্না কয়েকদিন গাড়িটাতেই থাকবে। আর টার্জান একলা যাবে বুনোটার সঙ্গে।

হান্নার আপত্তি ছিল, কিন্তু টার্জান তাকে বুঝালো যে অজ্ঞাত স্থানে বিপদের মুখে অন্যকে, বিশেষতঃ হান্নাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। এতে অনর্থক ঝামেলাই বাড়বে। বরং ক্যাপ্টেনের খোঁজ করে টার্জান আবার ফিরে আসবে এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করবে।

এইবার টার্জান বুনোকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো সেই অজানা গাঁয়ের উদ্দেশ্যে টার্জানের মাথায় এলো আর এক মতলব—সে বুনোটার সহায়তায় সাজলো আর এক বুনো—তেমনি সাজপোশাক, তেমনি পালকের টোপর। রোদে রোদে টার্জানের গায়ের রং অমনিতেই লালচে ছিল, কাজেই তার খুব অসুবিধে হলো না।

এক জায়গায় গিয়ে মুশকিল হলো। টার্জান ওদের কথা বোঝে না, নিজেও কথা বলতে পারে না। তাই সে বোবা সাজলো। আকারে ইঙ্গিতে যতখানি সম্ভব বলা এবং বোঝা যাবে।

বুনো টার্জানকে নিয়ে চলছিল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সোজা পথে। কিন্তু টার্জান তাতে রাজী নয়। সে যেতে চাইলো সমতল ভূমির উপর দিয়ে, যে পথে ওরা ক্যাপ্টেনদের দলবলসুদ্ধ সবাইকে নিয়ে গেছে, সেই পথে—হোক সেই পথ অনেক ঘোরা।

যতটা দূর ভেবেছিল টার্জান, বুনোদের গাঁ ততদূর ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা এসে পৌঁছলো গাঁয়ের কাছাকাছি। একটা জঙ্গল, ওটা পার হলেই তাদের গাঁ।

লালচামড়া বুনোগুলি বড় সরল, যদি কাউকে তারা বন্ধু ভাবে গ্রহণ করে, তবে তাদের জন্যে ওরা অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু যদি কখনও ওদের মনে সন্দেহের বিষ ঢোকে, তবে প্রাণ দিয়ে হলেও প্রতিশোধ তারা নেবেই। মনে ও মুখে ওদের এক—ভান নেই তাদের জীবনের কোথাও।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সবরকম বুনোদের সম্বন্ধেই টার্জান এই জ্ঞান আহরণ করেছিল। তাদের চরিত্র সে চট করেই বুঝে নিতে পারতো।

গাঁয়ের প্রান্তে এসে টার্জান আবার যাচাই করলো বুনোটাকে—না, সে কখনও শত্রুতা করতে পারে না। মুখে মধু মনে বিষ ওদের নেই। বুনোটা যখন বুঝেছে যে তাকে হাতে পেয়েও ওরা হত্যা করেনি, তখনই সে আত্মসমর্পণ করেছে। ভাবে ভঙ্গীতে বুঝিয়েছে, যাদের চুরি করে নেওয়া হয়েছে, তাদের উদ্ধার করবার দায়িত্ব তারও সমান।

সবদিক্ ভেবে চিন্তে এইবার বোবা লালচামড়া টার্জান ঢুকে পড়লো গাঁয়ের মধ্যে। বুনোটা তাকে একেবারে সোজা নিয়ে গেল গাঁয়ের বারোয়ারিতলায়।

অনেকটা চওড়া পরিষ্কার চত্বর, তার একদিকে গোটা দু'তিন চামড়ার তাঁবু, তার সঙ্গেই নতুন খাটানো হয়েছে আর একটা জল-রোধক ত্রিপলের তাঁবু।

চত্বরে বসে আছে অনেক লোক—নারী এবং পুরুষ উভয়েই। সকলেরই পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় একরকম। সকলেই হল্লা করছে,

আনন্দ করছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ক্ষান্ত দিয়ে ওইদিন নানা উৎসবে মেতেছে।

এমন সময় বুনোকে ঢুকতে দেখে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আতিকা, আতিকা!'

পরমুহূর্তেই সব চুপচাপ। আতিকার সঙ্গে নতুন একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে তাদের আনন্দ উল্লাস হঠাৎ থেমে গেলো।

এই লালচামড়া বুনোদের নিজেদের মধ্যেই রেষারেষি বড় বেশী। তাদের মধ্যে বহু দল, উপদল—বহুভাষী লোক নিয়ে এই জাতি গঠিত। পরস্পরের সঙ্গে যেমন তাদের সাদৃশ্য অনেক, তেমনি বৈষম্যও বড় কম নয়। তাই এই নতুন লোকটি কোন্ দলের তা না জানা পর্যন্ত এরা নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

আতিকা তাদের এই মনোভাব বুঝতে পেরেই চিৎকার করে কী যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠলো

মাঝখানে বসেছিল এক বৃদ্ধা, তার আদেশে অপরূপ সাজসজ্জায় সজ্জিত এক বুড়ো এগিয়ে এলো টার্জানের দিকে। তারপর তাকে ধরে নিয়ে গেলো মাঝখানে সবার মধ্যে। তার সঙ্গে সকলে মিলে করলো পান-ভোজন। ছদ্মবেশী টার্জানও হয়ে গেলো তাদেরই একজন।

এদিকে আতিকা ঘুরে ফিরে দেখে এলো বন্দী ক্যাপ্টেন স্মিথের দলবলের অবস্থা। তাঁদের তাঁবু খাটানো হয়েছে, আর সেই তাঁবুর মধ্যেই সাহেবরা বিশ্রাম করছেন। অবিশ্যি তাঁদের হাত-পা বাঁধা,

যেন পালাতে না পারেন। তাঁদের রাইফেল বন্দুক আর অন্য সব অস্ত্রপত্র একসঙ্গে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এর মর্যাদা বনোরা বোঝেনি, তাই অবহেলা ভরেই ওগুলোকে ফেলে রাখা হয়েছে।

টার্জান খানিকক্ষণ ওদের সঙ্গে বসে থেকে উঠে পড়লো। তারপর ঘুরে ফিরে সব দেখতে লাগলো। তাকে সব কিছু দেখানোর জন্যে সেই বৃদ্ধা তার সঙ্গে একজন লোক দিয়ে দিলো।

ঘুরতে ঘুরতে টার্জান একসময় গিয়ে ঢুকলো ক্যাপ্টেন স্মিথের তাঁবুতে। বন্দী সাহেবদের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে দু'হাতে পেট টিপে ধরে 'উঃ আঃ' শব্দ করতে লাগলো, তারপর লুটিয়ে পড়লো ওখানেই।

টার্জানের সঙ্গী লোকটা তক্ষুনি ছুটে গেলো ওদের বৈদ্য-পুরুতের কাছে। বৈদ্য যখন এলো, তখন টার্জানের হাতে পায়ে খিচুনি ধরে গেছে। বৈদ্য বুঝলো: ওকে ভূতে পেয়েছে। তখনি সে কতকটা ধুলো তুলে তাতে থুতু দিয়ে টার্জানের চার পাশে ছড়িয়ে দিলো। তারপর টার্জানের সেই সঙ্গীকে নিয়ে সে চলে গেলো। টার্জান একলা পড়ে রইলো।

টার্জন মিট মিট করে তাকিয়ে দেখলো—কেউ নেই। তখন সে উঠে এলো ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন তাকে কাছে আসতে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলেন। টার্জান বললো, 'ভয় পাবেন না ক্যাপ্টেন স্মিথ—আমি রেডইণ্ডিয়ান নই। আপনাদের উদ্ধার করবার জন্যেই আমি ওদের ছদ্মবেশ

ধারণ করে ওদের সঙ্গে মিশে আপনার কাছে আসবার সুযোগ করে নিয়েছি।'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন. 'কিন্তু আপনি কে, এবং কোথেকে আমাদের খবর পেলেন তাতো কিছুই বুঝতে পারলুম না!'

তাঁকে বেশী কথা বলতে না দিয়ে টার্জান বললো, 'সে সব কথা ধীরে সুস্থে হবে'খন; এখন কাজের কথা শুনুন। আমি এক্ষুনি আপনাদের সবাইকে মুক্ত করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না। ওরাও অনেকেই রাইফেলের গুলিতে প্রাণ হারাবে, আর আমাদেরও কেউ কেউ হয়তো ওদের বিষাক্ত তীরের মুখে প্রাণ দেবে।'

একটি চিন্তাই ক্যাপ্টেনকে পাগল করে তুলেছিল। তাই তিনি টার্জানের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার ছেলে স্মিথ আর বন্ধুকন্যা হান্নাকে হারিয়ে আমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?"

হেসে বললো টার্জান, 'স্মিথ আর হান্নার জন্যে আপনাদের ভাবনার কিছু নেই। ওরা নিরাপদেই আছে। এখন আমার কথা শুনুন। আমি আপনাদের একজনকে শুধু মুক্ত করে রেখে যাবো। কিন্তু সেও পড়ে থাকবে বন্দীর ভান করেই। তারপর যে মুহূর্তে আমাদের সংকেত পাবেন, সেই মুহূর্তেই সে আপনাদের মুক্ত করে দেবে। আপনারা রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবেন, প্রয়োজন হলে তার ব্যবহার করবেন। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে,—একেবারে দায়ে না পড়লে একটি লোককেও আপনারা আঘাত করতে পারবেন না।'

কানোদের উপর ক্যাপ্টেনের রাগ ছিল প্রচুর—তিনি সুযোগ পেলে ওদের সব কয়টাকে গুলি করে মারতেন। কিন্তু আপাততঃ টার্জানের কথায় রাজী হওয়া ছাড়া পথ নেই দেখে স্বীকার করলেন যে অপ্রয়োজনে তিনি গুলি ছুঁড়বেন না।

টার্জান তাদের দলের একজনের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলো —কিন্তু বেচারাকে, যেমন ছিল, তেমনি ভাবেই পড়ে থাকতে হলো।

টার্জান পেট চেপে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বাইরে চলে এলো।

সেই রাত্রেই টার্জান আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এলো আবার স্মিথ আর হান্নার কাছে। তারা ভাবতেই পারেনি যে টার্জান আবার এত শীগগিরই ফিরে আসতে পারবে। টার্জানের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তো হান্না হেসেই খুন! পরদিন ভোর হতে না হতে তারা চারজন মোটর চড়ে বেরিয়ে পড়লো গাঁয়ের দিকে। যখন বারোয়ারিতলায় এসে তারা পৌঁছেছে, তখন সেখানে একটি প্রাণীও নেই। এমন গর্জন করে বিকট একটা জানোয়ারকে এত দ্রুত চলে আসতে দেখে ভয়ে বুনোরা সব গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে।

গাড়ির শব্দ শুনেই তাঁবুর ভেতরকার সাহেবরা সব তৈরী হয়ে ছিল। তবে তাদের আর তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না—ধীরে সুস্থে সবাই গাড়িতে উঠলো। একে অন্যকে ফিরে পেয়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো।

বিকট গর্জন করে গাড়ি আবার ছুটে চললো। আতিকাও তাদের সঙ্গে চললো।

মরণের মুখোমুখী

আগেকার কথামতো এইবার টার্জানের বিদায় নেবার পালা। কিন্তু কেউ তাকে ছাড়তে রাজী নয়। ক্যাপ্টেন তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ইয়ংম্যান্, তোমার এত শক্তি, এত সাহস, তুমি কেন এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে? তুমি চলে এসো আমাদের সৈন্যদলে; দুদিনে তরতর করে তুমি উঠে যাবে অনেকের নাগালের বাইরে। তুমি এভাবে তোমার শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছো কেন?'

এমন উপদেশ টার্জান বহুবার শুনেছে, বহুজনে তাকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়েছে; কিন্তু যা তার মনের সঙ্গে খাপ খায় না তেমন উপদেশ সে গ্রহণ করতে রাজী নয়। বিশেষতঃ সৈন্যদলে শৃঙ্খলার নামে যে শৃঙ্খল পরানো হয়, টার্জানের ধাতে তা সইবে না।

অতি অল্পদিন হলেও বুদ্ধিমতী হান্না টার্জানের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝে নিয়েছিল। তাই সে বুঝেছিল যে যাযাবর টার্জানের মুখের সামনে এমন একটি লোভের ফল তুলে ধরতে হবে যার ফলে স্বেচ্ছায় সে ধরা দেবে। তাই চতুরা হান্না বললো, 'ক্যাপ্টেন, টার্জানকে আপনার অভিযাত্রিদলের একজন করে নিলে হয় না! যে দুর্গম পথে আমরা চলেছি সেখানে ওর সহায়তা যেমন আমাদের কাজে আসবে. তেমনি দুর্গম পথের অভিযাত্রী হয়ে সেও হয়তো যথেষ্ট আনন্দ পাবে।'

কিছুদিন হলো টার্জান এদের সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু তার

স্বাভাবিক নিরাসক্তির জন্যে ওদের খোঁজখবর আর কিছু নেয়নি। এখন হান্নার মুখে "দুর্গমপথের অভিযাত্রী" কথাটি শুনে তার নিরাসক্তির মুখোশ খসে পড়লো। সে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেনকে, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? কিসের অভিযাত্রি-দল এটা?'

ক্যাপ্টেন তখন জানালেন যে কোটাপ্যাক্সি আগ্নেয়গিরির তলদেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, তেল এবং ধাতব পদার্থের খনি আছে। সরকার বিশ্বস্তসূত্রে এই খবর পেয়েছেন, তাই তাঁরা পাঠিয়েছেন এই অভিযাত্রিদলকে। তারা অনুসন্ধান করে এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করবে। সরকার এই উদ্দেশ্যে তাদের প্রয়োজনায় সমস্ত মালপত্র এবং লোকজনের যোগান দিয়েছেন। অনুসন্ধানের জন্যে কয়েকজন গবেষকও আছেন তাদের সঙ্গে—হান্না তাদেরই একজন।

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হলো টার্জান। তাকে আর সাধাসাধি করতে হলো না, সে স্বেচ্ছায় অভিযাত্রিদলের সঙ্গে যোগদান করলো। এতে খুশী হলো সবচেয়ে বেশী হান্নাই।

কেন বলা মুশকিল; তবে আতিকাও টার্জানের সঙ্গ ছাড়তে চাইলো না। সে কেন যে নিজের গ্রাম এবং জাত-ভাইদের ছেড়ে এসেছে সে কথার জবাব হয়তো সে নিজেও দিতে পারবে না। সকলের সঙ্গে থেকে থেকে সে আস্তে আস্তে ইংরেজী ভাষাও শিখে নিতে লাগলো, আর টার্জান তার কাছ থেকে শিখতে লাগলো তাদের ভাষা।

টার্জান নিছক দেশভ্রমণের এবং নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের

উদ্দেশ্যেই দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম পেরু রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারপর রাজধানী থেকে সে লোকালয় ছেড়ে ক্রমশঃ অরণ্যের দিকে যেতে লাগলো। এক সময় যখন আর সভ্য জগতের কোন চিহ্নও তার চোখে পড়লো না, তখন সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। তার ইচ্ছা হলো এইবার সে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেডইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবে। এই উদ্দেশ্যেই সে ঘুরতে ঘুরতে এই পাহাড় মুল্লুকে এসে পৌছেছিল। তারপর ভাগ্যক্রমে হান্নার সঙ্গে তার দেখা। ক্রমে ঘটনাচক্রে আজ সে অভিযাত্রিদলের একজন।

ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটি নিয়ে সে আবার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই ফিরে যেতে চেয়েছিল। এখন যখন সে পথ বন্ধ এবং আতিকা তার সঙ্গী হয়েছে, তখন সে দুধের স্বাদ ঘোলেই মিটাবে বলে স্থির করলো। আতিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে তাদের ভাষা এবং জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলো।

যে পাহাড়ের নীচে ক্যাপ্টেন তাঁবু গেড়েছিলেন, সেখান থেকে সেইদিনই তাঁরা উঠে চলে গেলেন। তাঁদের ভয় ছিল বুনোরা যদি আবার এসে তাঁদের আক্রমণ করে। তাই খুঁজে পেতে এমন এক নিরাপদ স্থানে তাঁরা তাঁবু স্থাপন করলেন, যেখান থেকে নিশ্চিন্ত চিত্তে তাঁরা যেখানে খুশি অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন।

সরকারের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মালপত্র ও রসদ যোগাড় করেছেন, সেই সব রাজধানীতে মূল কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বহু লোকজনও সেখানে রেখে ক্যাপ্টেন ছোট একটা

দল নিয়ে এসেছিলেন এখানে। এখন এখানেও একটা কেন্দ্র স্থাপন করে মূল অভিযাত্রিদল এগিয়ে যাবে কোটাপ্যাক্সির দিকে। স্থির হলো যে, এই দলে থাকবেন ক্যাপ্টেন স্মিথ, জুনিয়র স্মিথ, হান্না, টার্জান, আতিকা এবং সঙ্গী কুলিদল। তাঁদের মালপত্র বহন করবার জন্যে কিছু খচ্চর আর একটা ট্রাকও নিতে হবে।

এই অভিযাত্রিদলের প্রধান কাজ হবে অনুসন্ধান চালানো। তাদের সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে পরবর্তী কাজ।

এইভাবে কাজকর্মের একটা ছক করে নিয়ে ক্যাপ্টেন একদিন শুভপ্রভাতে বেরিয়ে পড়লেন দলবল নিয়ে।

সারাটা দেশই প্রায় পাহাড়ে ঢাকা। সমতল আছে, জলাজঙ্গলও আছে। কোথাও পাশ কাটিয়ে, কোথাও এদের ডিঙ্গিয়ে অভিযাত্রিদল চলছে সমুখপানে। তাদের এই যাত্রাপথে আতিকা যথেষ্ট সহায়তা করলো।

আতিকারা পুরুষানুক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। কাজেই পথঘাটের স্থলুকসন্ধান, লোকজনের স্বভাবচরিত্র এবং আবহাওয়ার খবর তার কাছে ভালোই পাওয়া গেল।

পথে যদি কোন রেডইণ্ডিয়ানদের গ্রাম পড়ে তবে আতিকা আগেভাগেই তাদের সঙ্গে পরিচয় করে সাহেবদের ভয় ভাঙিয়ে দেয়। তারপর ক্যাপ্টেন দলবল নিয়ে গ্রামে উপস্থিত হয়ে গ্রামের মোড়লকে কোন একটা উপহার দিয়ে তুষ্ট করেন। সম্ভব হলে গ্রামবাসীদেরও কিছু না কিছু পুরস্কার দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট

রাখেন। অবিশ্যি এর পরিবর্তে তাঁরাও যথেষ্ট উপকার পেয়ে থাকেন।

ক্যাপ্টেন যদিও সঙ্গে করে প্রচুর শুকনো খাবার নিয়ে এসেছেন, তাহলেও তাতে অভিযাত্রিদলের হয়ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি হলো না। তাই কোন গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেই সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁরা খাবার উপহার নিতেন। এইভাবেই যেমন বন্যদের সঙ্গে তাঁদের সৌহার্দ্য বজায় রাখতেন, তেমনি নিজেদের প্রয়োজনও মেটাতেন।

আতিশা যদি বুঝতো যে গ্রামবাসীরা এই বিদেশী অভিযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা করবে না, তাহলে সে আগেভাগেই ক্যাপ্টেনকে তা জানিয়ে দিতো। ক্যাপ্টেন সম্ভবপর হলে সে গ্রামকে পাশে রেখে অন্য পথ ধরতেন। যদি তেমন পথ না পাওয়া যেতো তবে জোর করেই তাঁরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে যেতেন। কখনো কখনো এই কারণে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ছোটখাট লড়াইও করতে হয়েছে।

তবু মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, তাঁদের অগ্রগতি ভালোই হচ্ছিল।

টার্জানের ভারী আনন্দ। বহুকাল পর সে আবার মনের মতো কাজ পেয়েছে। সে আবার অরণ্যের মধ্যে ফিরে এসেছে, সে আবার ফিরে গেছে তার শৈশবের দিনগুলোতে কখনো সে লাফিয়ে চড়ছে গাছে, কখনো বা গাছের ঝুরি ধরে ঝুলছে।

টার্জানের কাণ্ডকারখানা দেখে দলের সকলেই অবাক্ হয়ে গেছে। স্মিথ ভাবছিলো—টার্জান কি বানর? কিন্তু সেও মুখে

কিছু বলতে সাহস পেলো না। ক্যাপ্টেন তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় টার্জানকে বুঝে নিয়েছিলেন ; তাই তিনি দলের সবাইকে সাবধান করে দিলেন, কেউ যেন টার্জানকে না ঘাঁটায়। তিনি এও বুঝেছিলেন যে যদি তিনি কাজ উদ্ধার করতে পারেন তবে তা টার্জানের সহায়তায়ই সম্ভব হবে।

হান্নাও বুঝেছিল যে, আকৃতি দৈত্যের মতো হলেও টার্জান অন্তরে একটি শিশুই। অনেকদিন জিজ্ঞেস করেও হান্না টার্জানের জীবনকাহিনী কিছুই জানতে পারেনি। সে যতবার টার্জানকে জিজ্ঞেস করেছে তার কথা, টার্জান ততবারই শুধু একটিমাত্র কথা বলেছে, 'আমাকে যা দেখছো, আমি তাই। এর বেশী আমার কোন পরিচয় নেই।'

হান্না বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষালাভ করেছে। মানুষের মনস্তত্ত্ব সে বোঝে। তাই সে অনুমান করেছিল যে, টার্জানের জীবনে এমন কোন রহস্য আছে যা সে জানাতে চায় না।

অরণ্যের মধ্যে টার্জানের আনন্দোজ্জ্বল রূপটি দেখে হান্না সত্যি অনুমান করেছিল যে অরণ্যের সঙ্গে টার্জানের জীবন জন্মসূত্রে বাঁধা আছে, তাই অরণ্যে এসেই তার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাই সে লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে এসে আনন্দ পায়।

সমস্ত দেখেশুনে হান্না যতখানি পারে টার্জানের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আর তাকে আনন্দোৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করে।

একদিন এক অরণ্যের প্রান্তে তাঁবু খাটিয়ে সবাই বিশ্রাম

করছে। টার্জান আর আতিকা বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে। যেতে যেতে তারা বনের ভিতরে গিয়ে পৌঁছলো।

হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ এ অরণ্যে টার্জান যেন এক নতুন জীবনের স্বাদ পেলো। আতিকা তাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তাদের শিকার করে ফিরতে হবে, কিন্তু টার্জানের সে খেয়াল নেই। তাকে যেন চলার নেশায় পেয়ে বসেছে। পথঘাটের কথা বিচার বিবেচনা না করে সে কেবল হেঁটেই চলেছে। বেচারা আতিকাও বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

এক সময় টার্জানের চলা থামলো। সে থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন খুব নিবিষ্ট হয়ে দেখছে। কাছে এসে আতিকা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছো অমন মনোযোগ দিয়ে?'

টার্জান আঙুল বাড়িয়ে দেখালো,—আতিকা দেখলো একখণ্ড পাথর, তাতে কী যেন আঁকা আছে।

পাথরটা দেখেই আতিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সে বললো যে এই পাথরটাতে নাকি তাদের দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে।

আতিকার কথা শুনে অবাক্ হলো টার্জান। এখানে তাদের দেবতার মূর্তি এলো কোত্থেকে! এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা খুঁজে না পেয়ে টার্জান বললো, 'আতিকা, এগিয়ে চলো এবার। আমার মনে হচ্ছে, এখানে আরও নতুন জিনিস কিছু আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবো। শুধু শুধু একটা দেবতার মূর্তি এখানে কিছুতেই পড়ে থাকতে পারে না। এগিয়ে চলো।'

এগিয়ে গিয়ে যেখানে তারা আবার থমকে দাঁড়ালো, সেখান থেকেই তাদের ফিরে আসতে হলো। টার্জান বললো, 'এমন

অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা এখানে ঢুকবো না। তার চেয়ে চলো দলবল সবাইকে নিয়ে এসে দেখি ব্যাপারটা কি?'

পথে চিহ্ন রেখে রেখে তারা আবার ফিরে এলো তাঁবুতে। তারপর টার্জান যা দেখেছিলো তাই খুলে বললো ক্যাপ্টেনকে।

টার্জানের কথা শুনে ক্যাপ্টেন তাঁর পুঁথিপত্র আর মানচিত্র খুলে বসলেন। কিন্তু কিছুতেই টার্জানের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'কোটাপ্যাক্সি অভিযান আমাদের যদি ব্যর্থও হয় তবু টার্জান যা আবিষ্কার করেছে তার জন্যে আমাদের অভিযান সার্থক হয়ে উঠবে। গোটা আমেরিকা মহাদেশই আগে ছিল রেডইণ্ডিয়ানদের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাদের সভ্যতার পরিচয় চিহ্ন ছড়িয়ে রেখেছিল সারা দেশে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ সুসভ্য ইওরোপীয়রা রেডইণ্ডিয়ানদের সুপ্রাচীন সভ্যতার চিহ্নগুলিকে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত করে দিয়েছে। যে কয়টা চিহ্ন এখনও ভাগ্যক্রমে টিঁকে আছে তাই নিয়েই রেডইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন ইতিহাস আর সভ্যতার কাহিনী রচনা করা হচ্ছে। ভাগ্যক্রমে আমরা টার্জানের কৃপায় তেমনি একটি সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছি। এর আগে অন্য কোন ইওরোপীয় এর সন্ধান পায়নি আমি মানচিত্র আর পুঁথিপত্তর ঘেঁটে দেখলুম, কোথাও এর চিহ্ন নেই টার্জানই এর আবিষ্কারক। চল আমরা নতুন আবিষ্কৃত ওই প্রাচীন কীর্তিকে দেখে আসি।'

দলের সকলেই ক্যাপ্টেনের কথায় শুধু সম্মতিই জানালো না, তারা পরম উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

নগরের প্রবেশপথেই বিরাট একটা স্তম্ভ। তার আগাগোড়া একটা

মূর্তি খোদাই করা। অভিযাত্রী দল যতই ভিতরে যেতে লাগলো ততই অবাক্ বিস্ময়ে তারা অভিভূত হয়ে পড়লো।

অরণ্যের মধ্যে যে এমন একটা বিপুল সম্পদ লুকানো ছিল কে তা আগে ভাবতে পেরেছিল। টার্জান বললো হান্নাকে, 'হাজার হাজার বছর আগে যখন আমাদের পূবপুরুষেরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো তখন আজকের অসভ্য এই আতিকার পূবপুরুষেরা গড়ে তুলেছিলো এই অপূর্ব সভ্যতার নিদর্শন। তারপর কিছুটা কালের আঘাতে আর কিছুটা সুসভ্য ইওরোপীয়দের পরাক্রমে আজ তারা ঘরছাড়া, তারা বুনো আর অসভ্য আখ্যা পেয়েছে।'

উচ্চশিক্ষিতা হান্নার মনেও কোন ক্ষুদ্রতা নেই, তাই রেডইণ্ডিয়ান-দের এই কীর্তিকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখতে লাগলো। হান্না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সব—তার জ্ঞানের ভাণ্ডার বোঝাই করছে, আর ভাবছে, সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে তাদের এই কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করবে।

সকলের মুখে প্রশংসা শুনে শুনে আতিকার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। সেও বুঝাতে চাইলো, উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারা এখনও এমনি ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে।

সুপ্রাচীন জনপদ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন স্মিথ আবার চললেন পশ্চিম মুখে। উৎসাহের আতিশয্যে তাঁদের পথ চলা দ্রুততর হয়ে ওঠে। তারপর এক সময় তাঁরা এসে পৌঁছালেন একটা পাহাড়ের নীচে। এখান থেকেই শুরু হবে তাঁদের গবেষণা আর অনুসন্ধান কার্য। আপাততঃ তাঁরা এখানেই তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন অনুসন্ধান চালাবেন, স্থির করলেন।

টার্জান তার হাত চেপে ধরে তাকে টেনে বার করলো গাড়ি থেকে।

যার যা কাজ তাই করতে লাগলো। টার্জান আর আতিকার কোন কাজ নেই, তাই তারা এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

ক্যাপ্টেন, হান্না আর স্মিথ—তাঁরাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন ভাবে নয়। তাঁরা মাটি খুঁড়ছেন, শুঁকছেন, পরীক্ষা করছেন। কোনটা ফেলে দিচ্ছেন, কোনটা বা সযত্নে তুলে রাখছেন!

একদিন সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন আনন্দে লাফাতে লাগলেন। বার্ধক্য ভুলে গিয়ে তিনি যেন আবার তাঁর শৈশবে ফিরে এসেছেন। বয়স ভুলে তাই লাফাতে তাঁর বাধছে না। তাঁর পরিশ্রম সফল হয়েছে। এখানকার মাটিতে তিনি কয়লার সন্ধান পেয়েছেন, হয়তো তেলও পাওয়া যেতে পারে।

এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে। তাঁরা মূল কেন্দ্রে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেবেন। রিপোর্ট বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তখন তাদের নির্দেশ দিলে তবে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হবে।

স্থির হলো, ওই দিন আর কোন কাজ হবে না। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে দিনটা কাটিয়ে দিয়ে পরদিন তাঁরা সদলে রাজধানীর দিকে যাত্রা করবেন

অন্যদিনের মতোই টার্জান আর আতিকা বেড়াতে বেরিয়েছে। যেদিকে এখনও যাওয়া হয়নি, ওই দিকটা ধরেই তারা যেতে লাগলো।

এক সময়ে তারা পাহাড়ের একটা গুহার কাছে এসে পৌঁছালো। আতিকা বললো, 'এইবার ফিরে যাওয়া যাক।'

টার্জানের মনে কৌতূহল চেপে বসেছে। গুহার ভেতরটা

একবার দেখলে হয় না!—যেই কথা সেই কাজ। টার্জান গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লো। আতিকাও বাধ্য হয়ে টার্জানের পিছনে পিছনে চললো।

গুহার ভিতরে একেবারে অন্ধকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গুহায় দিব্যি হেঁটে চলা যায়, আর পায়ের নীচেও বেশ সমতল। মনে হয়, মানুষের চলার জন্যেই বুঝি এই গুহা তৈরি করা হয়েছিল। তাই টার্জান এগুতে লাগলো।

ওরা যতই এগুতে লাগলো, পথ আর ফুরোয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিদ চেপে বসলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা দু'জনে চলতেই লাগলো।

একসময়ে তাদের ক্লান্তি এলো, ক্ষিদেও পেলো। কিন্তু সঙ্গে খাবার নেই, আর বিশ্রামেরও জায়গা নেই! অতএব চলা ছাড়া গতিও নেই।

আতিকা বারবার তাকে ফিরে যেতে বললো কিন্তু কাজ আরম্ভ করে তা শেষ না করা পর্যন্ত টার্জান কখনও থামতে জানে না।

কতক্ষণ যে তারা অমনিভাবে চলেছিল, তার খেয়াল নেই। তবে টার্জানের মনে হলো অন্ততঃপক্ষে দু'দিন দু'রাত্রি তারা পথ চলেছে। এখন দেহ আর তাদের চলতে চায় না। তবু চলতেই হবে, নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

এমনি সময়ে কোথা থেকে ভেসে এলো এক মৃদু গর্জন। তারপর এক দমকা জলো হাওয়া তাদের ক্লান্ত দেহে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলো।

কোন রকমভাবে টেনে হিঁচড়ে দেহটাকে তারা গুহার প্রান্তে এনে রাখলো—তার নীচেই গুরু গর্জনে বয়ে চলছে সমুদ্র। এক পা এগুলেই তারা সমুদ্রে পড়বে।

থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো টার্জান আর আতিকা।

জলদস্যুর গর্তে

একদিন দু'দিন তিনদিন পর্যন্ত কাপ্টেন অপেক্ষা করলেন, কিন্তু টার্জান কিংবা আতিকার কোনও সন্ধান পেলেন না। যে কাজের উদ্দেশ্যে তাঁরা এখানে এসেছিলেন তা সফল হয়েছে। অতএব এখানে আর অনির্দিষ্টকাল তাঁরা অপেক্ষা করতে পারেন না। হয়তো এর জন্যে সরকারের কাছে কৈফিয়তও দিতে হতে পারে। তাই তিনদিন অপেক্ষা করে তাঁরা তাঁবু তুলে ফেললেন। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে টার্জান এবং আতিকা দু'জনেই মৃত্যু বরণ করেছে।

টার্জানকে ক্যাপ্টেন যে কয়দিন দেখেছেন তাতে তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যে ভাবনা চিন্তা না করে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াই টার্জানের স্বভাব। হয়তো এমনিভাবে স্বেচ্ছায়ই বিপদের মুখে পা বাড়িয়ে টার্জান মৃত্যু বরণ করেছে,—সবাই ভাবলো একথা।

টার্জান কিংবা আতিকা—তারা কেউ এদের আত্মীয় নয়, এমনকি দলেরও কেউ নয়। নেহাত যেন উড়ে এসেই এদের দলে মিশে গিয়েছিল; অতএব এদের আকস্মিক তিরোধানে দলের লোকদের

খুব দুঃখিত হবার কথা নয়। কিন্তু যে ভাবে তারা নিরুদ্দেশ হয়েছে তা ভেবেই সকলে দুঃখিত হলেন। বিশেষতঃ এই অল্পদিনেই টার্জান সকলের মন জয় করে নিয়েছিল।

হান্নার মনেই সব চেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিল। বস্তুতঃ তারই আগ্রহে ক্যাপ্টেন তিনদিন পর্যন্ত টার্জানের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। এই তিনদিন পর্যন্ত দলের লোকেরা যেমন টার্জানের সন্ধান করেছে, হান্না নিজেও তাদেব চেয়ে কম করেনি। সে স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছে, কিন্তু কোথাও তাদের চিহ্নও পাওয়া গেল না।

অবিশ্যি হান্নার মনে ক্ষীণ একটু আশা এখনও আছে। তার ধারণা টার্জান নিশ্চয়ই অপঘাতে মরবে না। যে কোন বিপদই আসুক না কেন, সে নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারবে। হান্নার মনে হলো টার্জান হয়তো ঘুরতে ঘুরতে রেডইণ্ডিয়ানদের সেই প্রাচীন কীর্তির কাছে চলে গেছে।

হান্না ক্যাপ্টেনেব কাছ থেকে কথা আদায় করলো যে ফিরতি পথে তারা একবার সেই রেডইণ্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত পুরীটি তল্লাশ করে দেখে যাবে। এবপর আর তাদের অপেক্ষা করবার কোন কারণ রইলো না। তারা বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে টার্জান ভাবছেঃ এক পা এগুলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। আবাব তিনদিন তিনরাত সমানে হাঁটলে হয়ত তারা গুহা পার হতে পারবে। কিন্তু তাদের শরীরের যে অবস্থা তাতে আর এক পা চলবার শক্তিও আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই ফিরতে

টার্জান ফাইটস্ ফর লাইফ—
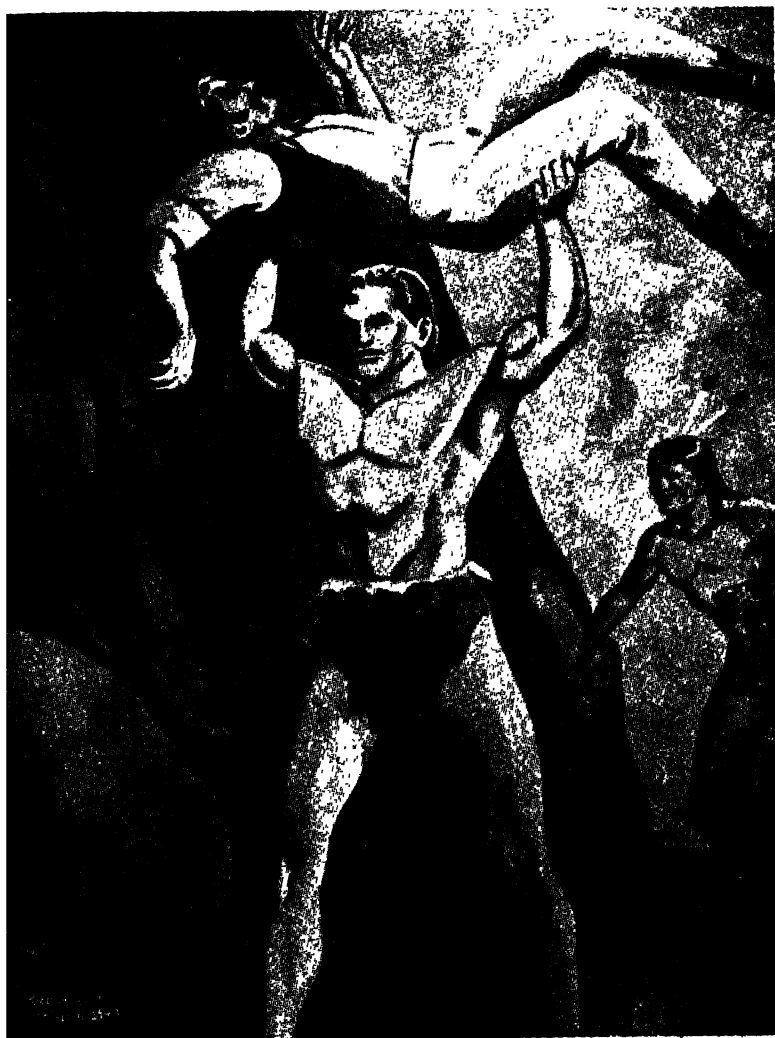
টার্জান ফার্ডিনাগুকে দু'হাতে তুলে ধরলো মাথার উপর।

চাইলেও ফিরতে পারবে না। এই গুহার মধ্যেই রচিত হবে তাদের সমাধি ; কেউ জানবে না কোনদিন সেকথা !

হতাশ হয়ে পড়ে টার্জান। কত বাধা বিপত্তি কত বিপদের মুখে কতবার সে পড়েছে, কিন্তু কোন না কোন উপায়ে সে বিপদ কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন আকাশ-পাতাল ভেবেও সে কোন পথের সন্ধান পাচ্ছে না। জীবনে তাকে যে এমন অবস্থায় কখনও পড়তে হবে তা সে কোন দিন কল্পনাও করেনি।

বেচারা আতিকা চুপ করে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। অশান্ত সমুদ্র গোঁ-গোঁ গর্জন করছে, আর ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাহাড়ের বুকে। কিন্তু পাহাড়ের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

আতিকার দিকে তাকিয়ে টার্জানের মন লজ্জায় ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে যায়। আজ তার জন্যেই আতিকাকেও মরতে হচ্ছে। সে নিজ আত্মীয়বন্ধুদের ছেড়ে টার্জানের সঙ্গ নিয়েছিল তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়েই। কিন্তু টার্জানের সেই বীরত্ব আজ আর কোন কাজেই লাগছে না।

টার্জান ভাবছে : আতিকা বার বার ফিরে যাবার কথা বলছিলো, কিন্তু টার্জানই সে কথা কানে তোলেনি, আর আজ সেই জন্যেই তাদের এই দুরবস্থা। তার উপদেশ শুনলে আজ তারা এমন ভাবে মরণের মুখে এসে দাঁড়াতো না।

নাঃ !—গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে টার্জান। এই ভাবে হাত পা ছেড়ে দিয়ে সে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না। মরতে হলেও বাঁচবার জন্যে শেষ চেষ্টা করে তবে সে মরবে। শেষ বারের মতো চেষ্টা করে সে দেখবে বাঁচতে পারে কি না।

খাড়া পাহাড় বেয়েও তো ওপরে ওঠা যায়—এই ভেবে সে তাকালো উপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সত্যিই সে বিপদের মুখে পড়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তাই সে সামনে আর পিছনে ছাড়া অন্য দিকে তাকানোর কথা ভাবতেই পারেনি। অথচ উপরের দিকে তাকালে সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেতো।

টার্জানের আনন্দধ্বনি শুনে আতিকাও উপরের দিকে তাকালো। দেখলো : উপর থেকে ঝুলছে একটা লোহার শিকল—একেবারে নেমে এসেছে গুহার মুখ অবধি।

অবাক্ হয়ে ভাবলো তারা : ভগবান্ই বুঝি তাদের বাঁচিয়ে দেবার জন্যে উপর থেকে শিকল ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

যাহোক আর ভাবনা চিন্তা করবার সময় নেই। টার্জান প্রথমেই শিকল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে, কিন্তু শিকল তেমনি অটুট রইলো দেখে সে সাহস পেলো যে শিকল বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠা যাবে।

টার্জান আতিকাকে উপরে তুলে ধরলো। বললো, 'তুমি আগে উপরে উঠে যাও, আমিও তোমার পরে আসছি।'

দুর্বল আতিকা আর কথা বললো না। সে টার্জানের নির্দেশে শিকল বেয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলো। উপরে উঠে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো আতিকা ; বললো, 'শিগগির উঠে এসো টার্জান! দেখো এসে কী মজা!'

মজার জিনিসটা টার্জান অনুমান করতে না পারলেও ভাবলো যে নিশ্চিতই ওখানে আনন্দিত হবার মতো বস্তুর সন্ধান

পেয়েছে আতিকা। এই ভেবে টার্জানও শিকল ধরে উপরে উঠে এলো।

উপরে উঠে যা দেখলো তাতে সেও অবাক্ হলো যথেষ্ট। শিকল শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখে সে এর কারণ বুঝে উঠতে পারেনি। এটাকে সে ভগবানের দান বলেই বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু উপরে উঠে যা দেখলো, তাতে বুঝলো এটা ভগবানের লীলা নয়, সাধারণ মানুষেরই চেষ্টাকৃত ব্যাপার!

নির্জন এই পাহাড়ের কোলে সুন্দর ছোটখাট একটি কুটীর। টার্জান আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে সেই কুটীরে ঢুকলো। কিন্তু ভিতরে কেউ নেই! অথচ কুটীরের মধ্যে পরিপাটি করে একটি বিছানা পাতা! বিছানার পাশেই একটা ছোট টেবিল। টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ঢাকা দেওয়া। মনে হয় কেউ বুঝি সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গেছে।

টার্জান ঘরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, সভ্যমানুষের বসবাসের উপযোগী সমস্ত বন্দোবস্তই সেখানে রয়েছে। অবাক্ হয়ে ভাবলো টার্জান, এ তো রেডইণ্ডিয়ান বা কোন অসভ্যের বাসস্থান নয়, এ যে দস্তুরমতো সুসভ্য মানুষের কাণ্ডকারখানা।

আতিকা জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু বুঝতে পারছো টার্জান?'

টার্জান বললো, 'এসব বোঝাবুঝি পরে হবে, আগে কিছু খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে নাও। ভাগ্যক্রমে যখন খাবার জুটে গেছে তখন এর সদ্ব্যবহার করে নাও!'

এই বলে দু'জনেই ইচ্ছামত খেয়ে নিলো। খাবার ব্যবস্থাটুকু ভালোই ছিল। গত তিন দিন ধরে তাদের পেটে কোন দানাপানি

পড়েনি! এইবার ভরপেট ভোজনের পর তাদের দেহ আলস্যে যেন ভেঙে পড়লো। পরিপাটি করে সাজানো বিছানায় তারা শুয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাক ডাকতে লাগলো।

ফার্ডিনাণ্ড এসে ঘরে ঢুকলো। মাথায় লোমওয়ালা টুপি, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, পরনে ব্রিচেস আর পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো। পিঠে ঝুলছে একটা বন্দুক আর হাতে একটা খরগোশ—টপটপ করে তা থেকে পড়ছে রক্তের ফোঁটা।

ঘরে ঢুকে ফার্ডিনাণ্ড যা দেখলো তাতে তার চক্ষু ছানাবড়া। মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পরক্ষণেই খরগোশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বন্দুকটা তুলে ধরলো। তারপর কী ভেবে বন্দুক নামিয়ে রাখলো সে।

জনমানবের দুরধিগম্য এই পাহাড়ের উপর তার নির্জন কুটীরে নবাগত দুইটি মানবসন্তানকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে দেখে ফার্ডিনাণ্ড ক্রোধে অধীর হয়ে বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিল। ভেবেছিল ওদের আর ঘুম ভাঙার সুযোগ দেবে না ; এই ঘুমই তাদের শেষ ঘুম হবে। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই তার মনে ঔৎসুক্য জাগলো। কে এই অসমসাহসী যুবক, যারা এখানে এসে পৌঁছল!

ফার্ডিনাণ্ড বাইরে এসে আবার তাকালো সমুদ্রের দিকে। নাঃ, কোথাও কোন জাহাজ বা নৌকারও চিহ্নমাত্র নেই।

এবার প্রশ্ন জাগলো ফার্ডিনাণ্ডের মনে, তবে এরা এলো কোত্থেকে, আর কী ভাবেই বা এখানে এলো! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এদের একজন ইওরোপীয়, অন্যজন এদেশীয় রেডইণ্ডিয়ান।

এ ছটি ভিন্ন দেশীয় লোকই বা একসঙ্গে জুটলো কী করে? এই সব ভাবনাই ফার্ডিনাণ্ডের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুললো। আর এরই ফলে সে হাতের বন্দুক নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো ওদের ঘুম ভাঙবার জন্যে।

কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারলো না। কতক্ষণ ঘর বার করে সে আবার ফিরে এলো ঘরে। তারপরই লাল লোকটার পা ধরে দিলো এক হ্যাঁচকা টান।

আতিকা বিছানা থেকে পড়ে গেল মাটিতে। ঘুম তার ভেঙে গেলো। উঠে বসে সে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো, মাথায় তার লেগেছে।

লাল লোকটাকে কাতর ভাবে তাকাতে দেখে ফার্ডিনাণ্ডের মনে খুবই কৌতুক জাগলো। সে আতিকার ছই কান ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে, জিজ্ঞেস করলো, 'কি স্যাঙাত, কী মনে করে এখানে?'

আতিকা ফার্ডিনাণ্ডের ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়েছিল। তাই সে তার প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। শুধু কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

জবাব না পেয়ে ফার্ডিনাণ্ডও ভয়ানক চটে গেলো। সে হঠাৎ ছমদাম করে আতিকার উপর কিল ঘুষি চালাতে লাগলো। আতিকাও জবরদস্ত জোয়ান—এতখানি অত্যাচার সেও নীরবে সইতে রাজী নয়। তাই সেও পালটা আক্রমণ করলো ফার্ডিনাণ্ডকে। তারপর ছ'জনে জড়াজড়ি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

এদের ছুটোপাটিতে টার্জানের গভীর ঘুমও ভেঙে গেলো।—সে ঘুম জড়ানো চোখেই ডাক দিল, 'আতিকা।'

আতিকার তখন কথা বলবার অবসর নেই। অবিশ্যি তার দরকারও হলো না—টার্জান একটু মাথা তাকিয়ে বুঝতে পারলো অবস্থাটা। আগেকার ঘটনা না দেখলেও সে অনুমান করলো যে ওই লোকটাই আতিকাকে প্রথম আক্রমণ করেছে। এই ভেবে টার্জান তাড়াতাড়ি আতিকাকে ওর হাত থেকে মুক্ত করলো।

ততক্ষণে ফার্ডিনাণ্ড সামলে নিয়েছে। সে টার্জানের দিকেই রুখে এলো। টার্জান বাঁ হাতে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো। টার্জানের আঙুলের চাপে যেন ফার্ডিনাণ্ডের হাতের হাড় গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো। সে চিৎকার করে উঠলো। টার্জান তাকে ছেড়ে দিল। বললো, 'ফের যদি তুমি ওর গায়ে হাত তোলো, তবে এর ফল তোমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। অতএব সাবধান।'

ফার্ডিনাণ্ডকে আজ পর্যন্ত এমন ভাবে কেউ কথা বলেনি। সে চিরকাল অন্যের উপর খবরদারিই করে এসেছে,—কারও হুকুম মেনে চলা তার স্বভাবে নেই। তাই টার্জানের কথা শুনে তার মাথায় খুন চড়ে গেলো। চিৎকার করে বললো, 'ব্যস, আর একটি কথাও নয়। যতটুকু বলেছ, এর জন্যে অন্য কেউ হলে তার প্রাণ যেতো। খবরদার, আর একটি কথাও বোলো না।'

অট্টহাসি হেসে উঠলো টার্জান। সে বললো, 'বাহাদুর বটে! খুব যে ভয় দেখাচ্ছো—বলি, এখনও লড়তে চাও নাকি?'

ফার্ডিনাণ্ড চট করে বন্দুক তুলে নিলো হাতে। টার্জানের

হাতে সময় নেই যে সে ছুটে গিয়ে ফার্ডিনাণ্ডকে বাধা দিতে পারে। এদিকে ফার্ডিনাণ্ড তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক্ করেছে।

টার্জানের হাতের কাছে ছিল জলভরা গ্লাস। সে চট করে গ্লাসটা ছুঁড়ে মারলো ফার্ডিনাণ্ডের হাতের কবজি লক্ষ্য করে।

'গুড়ুম' শব্দে কুটীরের ছাদ ভেদ করে বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেলো; ফার্ডিনাণ্ডের হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেলো মাটিতে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ফার্ডিনাণ্ড। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো আতিকা।

আতিকার হাততালিতে ফার্ডিনাণ্ড আবার চটে গেলো। সে আহ্বান জানালো টার্জানকে, বললো, "বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়বো।"

সানন্দে টার্জান বেরিয়ে এলো বাইরে। তাদের ডুয়েলের প্রথম ক্ষেপেই টার্জান ফার্ডিনাণ্ডকে দু'হাতে তুলে ধরলো মাথার উপর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আরও চাও লড়তে।"

ফার্ডিনাণ্ড হার মানলো। সে টার্জানকে ওস্তাদ বলে স্বীকার করলো। টার্জান তাকে নামিয়ে দিতেই ফার্ডিনাণ্ড তার হাতে চুমো খেলো।

এরপর শুরু হলো তাদের আলাপ পরিচয়ের পালা। ফার্ডিনাণ্ড কোথা থেকে নিয়ে এলো দু'বোতল মদ আর খানিকটা বাসি মাংস। খেতে খেতেই তাদের পরিচয় হলো।

ফার্ডিনাণ্ড বললো যে সে একটা জলদস্যুদলের সর্দার। তার দু'খানা জাহাজ আছে, প্রচুর গোলাগুলি আর সৈন্যসামন্ত আছে—ওরা গেছে সমুদ্রে ডাকাতি করতে। এই পথে যে সব জাহাজ

যায় সুবিধা পেলেই জলদস্যুর দল তাদের সর্বস্বান্ত করে। পাহাড়ের ওপারে এই কুঁড়ে ঘরটাই হলো তাদের ঘাঁটি। ধারে কাছেই এরকম আরও কতকগুলো কুঁড়েঘর আছে, তার চেলাচামুণ্ডাদের বিশ্রামের জন্যে।

টার্জান দেখলো, এই দস্যু এখন বশ্যতা স্বীকার করলেও আবার কখন যে তাকে খুন করে বসবে তার ঠিক নেই। তাই সে-পথ বন্ধ করবার জন্যে টার্জান তার মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বললো যে সে এই পাহাড়েই একটা সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। সেখান থেকে বেরুতে গিয়েই সে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছেছে।

টার্জান বুঝলো দস্যুরা তার কাছ থেকে সোনার খনির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তাকে খুবই খাতির করবে। ফার্ডিনাণ্ডও ভাবলো তাই।

জলদস্যুদের সঙ্গে

হান্না ফিরে এসে জানালো ক্যাপ্টেনকে যে তারা তন্ন তন্ন করে ঐ পুরানো পুরীটি খুঁজেছে, কিন্তু টার্জানের কোনও সন্ধান পায়নি। অতএব টার্জান যে ওদিকে যায়নি, এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ।

এই সংবাদে ক্যাপ্টেনও খুব দুঃখিত হলেন। তিনিও আশা করে-ছিলেন এবং মনে মনে চাইছিলেন যে টার্জানকে যেন পাওয়া যায়।

তিনি ভবিষ্যতের যে কর্মপন্থা মনে মনে ঠিক করেছিলেন, টার্জান তাঁকে অনেকটাই সাহায্য করতে পারতো তাতে।

কিন্তু দৈবের উপর কারও হাত নেই। কাজেই টার্জানকে যখন পাওয়া গেলো না, তখন বৃথা তার জন্যে আর অপেক্ষা না করে ক্যাপ্টেন সদলবলে চললেন মূল কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে—পইটা বন্দরে। তাঁরা কিছুদিন আপাতত ওইখানেই বিশ্রাম করবেন এবং পরবর্তী অভিযানের জন্যে তৈরী হবেন।

সকলের সঙ্গে হান্নাও পথ চললে, কিন্তু মনে তার আনন্দ নেই। টার্জানের মধ্যে সে পেয়েছিল একটি খাঁটি মানুষের সন্ধান। সভ্যজগতের লোক সে, সভ্যতার পালিশ তার দেহে মনে, কিন্তু টার্জান এসে সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে। তাই সে মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করেছিল টার্জানের সঙ্গ।

স্মিথ বুঝেছিল, হান্নার ব্যথা কোথায়? তাই সে বার বার তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল এই বলে যে পথের মানুষ পথেই হারিয়ে গেছে, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ কি?

কিন্তু এই সান্ত্বনায় হান্নার মন ভরে না। সে যে সত্যদৃষ্টি লাভ করেছে! সেই দৃষ্টিই তাকে ভিন্নমুখী করে দিয়েছিল। হান্নার মনের এই অস্বস্তি ক্যাপ্টেনও অনুভব করেছিলেন। তিনি তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে বললেন, "মিছে তুমি ভাবছো হান্না। টার্জান ওই পাহাড় অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারে না। ওখান থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। আর আমরা সদলবলে তো আবার ওখানে যাচ্ছিই। যে বিরাট কাণ্ডকারখানা আমরা ওখানে শুরু করবো, তার ফলে সে যেখানেই থাকুক, আমাদের সন্ধান সে

পারবেই। কাজেই মিছে কেন ভাবছো—ওকে আমরা খুঁজে বার করবোই।"

হান্না ক্যাপ্টেনের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলো। তার মনে হলো, আবার যখন তারা পাহাড়ে যাবে, তখন হয়তো তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এই আশায়ই সে বুক বাঁধলো।

স্মিথ বুঝলো, টার্জান ওর মন মজিয়েছে। তাই সেও টার্জানের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতে লাগলো। এতে করেও যদি সে তার মন পায়!

দলের সবগুলো লোক অবাক্ হয়ে গেলো ফার্ডিনাণ্ডের ব্যবহারে। তারা এতকাল একে দলপতিরূপেই দেখে এসেছে—কাউকে তোয়াজ করা, খাতির করা তার স্বভাবে নেই। অথচ দলের লোকেরা ফিরে এসে যখন দেখলে, অপরিচিত একজন লোককে তাদের দলপতি এত খাতির আপ্যায়ন করছে, তখন তারা অবাক্ হলো। অথচ কোন কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই—শুধু নির্বিচারে দলপতির নির্দেশে টার্জানকেও খাতির করে যাচ্ছে।

ফার্ডিনাণ্ড বুঝেছিল, টার্জানকে হাতে রাখতে হবে—যে করেই হোক তার কাছ থেকে সেই সোনার খনির খবরটা আদায় করতে হবে। তার-পর,—তারপর সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। ফার্ডিনাণ্ড জীবনে এভাবে শুধু টার্জানের হাতেই নাস্তানাবুদ হয়েছে—এটা এমন-ভাবে হজম করা যাবে না।

আতিকা বলছিলো, "এরা বড় সাংঘাতিক লোক টার্জান।

আমার মনে হয় এদের এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভালো। কোনদিন যে এরা কী করে বসবে—তা বোঝা যায় না।”

হেসে বললো টার্জান, “মিছে তুমি ভাবছো আতিকা। যে লোভ ওদের আমি দেখিয়েছি, সে লোভের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ওরা আমাদের কিছুই করবে না,—বরং জামাই আদরেই রাখবে। কিন্তু সে কথা যাক, আমি ভাবছি অন্য কথা।”

“কি ভাবছ?”

একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললো টার্জান, “না—এখন থাক, পরে বলবো।”

দিন যায়। ধৈর্য ধরে ছিল ফার্ডিনাণ্ড, কিন্তু টার্জান আপনা থেকে সোনার খনির কথা আর কিছু বলছে না দেখে সে বড় অস্বস্তি বোধ করে। অথচ যেচে জিজ্ঞেস করতে গেলে তার গরজ বেশী বুঝে টার্জান বেঁকে বসতে পারে। তাতে হিতে বিপরীতই হবে।

তাই ফার্ডিনাণ্ড ভাবলো, আরও দু'চার দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক। টার্জান আপনা থেকে কিছু বলে কিনা!

এদিকে টার্জানও আতিকাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের উপর। এখানে সে যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা কুটীরগুলোতে মাঝে মাঝে সে হানা দেয়—আর তার অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে। তারা নানাভাবে ফার্ডিনাণ্ডের দলে এসে জুটেছে। দস্যুবৃত্তিই এদের একমাত্র ব্যবসায়। বছরে দু'বছরে এক আধবার

তারা দেশে যাবার সুযোগ পায়,—তখনই তাদের রোজগারের অংশ বাড়িতে নিয়ে আসে।

টার্জান আবও ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে—খুঁজে দেখে বেরুনোর কোন পথ আছে কিনা। এখানে এই দস্যুদলের সঙ্গে তার মোটেই ভালো লাগছে না। অথচ সে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালেও ফার্ডিনাণ্ডের চর যে তার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাও সে টের পায়। কাজেই সে ইচ্ছে করলেই যে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, তারও সম্ভাবনা কম। একমাত্র যদি ফার্ডিনাণ্ডের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিতে পারে, তবেই তার পক্ষে পালানো সম্ভব।

কিন্তু বিপদ শুধু এখানেই নয়।—যতখানি সম্ভব সে পাহাড়ের টপটা ঘুরে দেখছে, কিন্তু কোথাও সে পথের সন্ধান পায়নি আর টপ থেকে নীচে যাবারও কোন ব্যবস্থা সে কোথাও দেখতে পায়নি। কাজেই পালানোর ব্যবস্থা যদিও সে করতে পারে কিন্তু পথ নেই।

শেষ পর্যন্ত টার্জান ঠিক করলো, এইভাবে এখানে বন্দীজীবন যাপন করা চলবে না, যেভাবেই হোক এখান থেকে বেরুতেই হবে। অবিশ্যি ফার্ডিনাণ্ড টার্জানকে প্রস্তাব দিয়েছে, সে যদি তাদের দলে ভরতি হতে চায়, তবে তারা সানন্দে তাকে দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। টার্জান ফার্ডিনাণ্ডের কথায় কোন জবাব দেয়নি—সময় চেয়েছে।

এদিকে ফার্ডিনাণ্ডের দলবল বেরুবে সশস্ত্র অভিযানে—তারা খবর পেয়েছে, মালবোঝাই একটা জাহাজ ট্রুজিলো বন্দর থেকে

ইকুয়েডর রাজ্যের গুইয়াকিল বন্দরের দিকে যাত্রা করেছে। এই জাহাজটা লুঠ করতে পারলে তাদের অনেকদিন বসে থাকলেও চলবে। এখন ফার্ডিনাণ্ডের চিন্তা হল টার্জানকে নিয়ে। কী করবে সে,—তাকে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়, কারণ সে পালিয়ে যেতে পারে। আর যদি সে পালিয়ে যায়, তবে সোনার খনিও স্বপ্নে মিলিয়ে যাবে। তাই ফার্ডিনাণ্ড ভাবলো যদি কোনরকমে তাকে বুঝিয়ে সঙ্গে নিতে পারে।

টার্জান কিন্তু সহজেই সম্মতি দিল। সে বুঝলো, ফার্ডিনাণ্ডের জাহাজ পইটাবন্দর ছুঁয়ে বেরুবে। তাই সে ভাবলো: যদি জাহাজ পইটাবন্দর হয়ে যায়, তবে সে যেভাবেই হোক, ওদের হাত থেকে পালিয়ে যাবে।

টার্জান শুনেছিল, ক্যাপ্টেন স্মিথের মূল কেন্দ্র পইটাবন্দরে। যদি সে একবার পইটাবন্দরে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তবে সে যেভাবেই হোক ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।

এই ভেবে টার্জান বললো যে ওদের সঙ্গে একবার ঘুরে এলে ভালোই হয়। এর মধ্যে ওদের দস্যুবৃত্তি দেখে যদি তার ভালো লাগে তবে সেও তাদের দলে ভিড়ে পড়বে।

কথাটা ফার্ডিনাণ্ডেরও ভালো লাগলো। টার্জানের মত এমন একটা শক্তিমান্ পুরুষকে সে দলের মধ্যে পেলে তার নিজের শক্তিও অনেকটা বেড়ে যাবে। তার কার্যকলাপ পছন্দসই হলে কালক্রমে তাকে সরকারী সর্দার করবার কথাও ফার্ডিনাণ্ড ভাবতে লাগলো।

যথাসময়ে ফার্ডিনাণ্ডের জাহাজ জলে ভাসলো। বাইরে

থেকে দেখলে মনে হয়—ছ'খানা বাণিজ্য-জাহাজ সওদা করতে বেরিয়েছে। জাহাজের উপরে বণিকের নিশান টাঙানো,—যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। জাহাজের ভেতরে আছে এক গুপ্ত কক্ষ--তারা বলে মালখানা। কামান-বন্দুক আব গুলি-বারুদে সেই ঘর বোঝাই।

জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে মাঝী-মাল্লা পর্যন্ত প্রত্যেকটা লোকই এক একটা দুর্দান্ত দস্যু। ফার্ডিনাণ্ড অনেক বাছাই করেই এদের দলে নিয়েছে। বাইবে থেকে দেখলে এদের প্রত্যেকেই এক একজন শান্তশিষ্ট নিরীহ নাগরিক আর অন্তরে অন্তবে প্রত্যেকেই এক একটি আস্ত শয়তান।

বাইরের ভড়ং বজায় রাখবার জন্যে তাদের জাহাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী মালপত্রও আছে যথেষ্ট। এই মালপত্রেব লোভ দেখিয়েই তারা বণিকদের প্রলোভিত করে। অবিশ্যি তাদের মালপত্রের জন্যে তাদের মোটেই ভাবতে হয় না। বাণিজ্য-জাহাজ লুঠ করে যা পায়, তা দিয়েই তারা তাদের জাহাজ সাজিয়ে রাখে।

একটা জাহাজ এইভাবে মালপত্র দিয়ে সাজিয়ে ওরা রাখে, আর একটা জাহাজে থাকে সুসজ্জিত সৈন্যদল। ওটা হল মানোয়ারী জাহাজ। এই পথে চলতে গেলে অনেক জাহাজকেই সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চলতে হয়, কারণ এই পথে জলদস্যুর উপদ্রব বড় বেশী।—এই অজুহাত দেখিয়ে ফার্ডিনাণ্ড তার দস্যুদলের একটা প্রধান অংশকে সৈন্যদের সাজসজ্জা পরিয়ে ওই জাহাজে তুলে নেয়—বাইরের কেউ সন্দেহ করবারও সুযোগ পায় না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানোয়ারী জাহাজের সৈন্যরাই আকস্মিক-ভাবে হানা দেয় বাণিজ্য-জাহাজের উপর। তারপর ফার্ডিনাণ্ডের বাণিজ্য-জাহাজের লোকেরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

আবার কখনও কখনও বাণিজ্য জাহাজের ব্যবসায়ীদের নিজেদের জাহাজে ডেকে আনে। তারপর তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে কিংবা সুবিধা বুঝে ওদের জাহাজের সমস্ত মালপত্র নিজেদের জাহাজে তুলে নিয়ে ওদের জাহাজ দেয় ডুবিয়ে।

টার্জান এত সব কিছু জানত না। তাই সে সহজ ভাবেই ওদের জাহাজে চড়ে বসলো। বলা বাহুল্য আতিকাও তার সঙ্গী হল।

ফার্ডিনাণ্ড নিজে রইলো মানোয়ারী জাহাজে—সৈন্যদলের প্রধান হয়ে। টার্জান বললো যে, প্রথমেই সে কোনরকম হানা-হানির মধ্যে থাকতে চায় না,—তাই তাকে বাণিজ্য-জাহাজে থাকতে দেওয়া হলো।

টার্জান তার মতলবের কথা বিস্তৃতভাবে আতিকাকে জানায়নি, শুধু আভাস দিয়েছে, যেকোন সময় তাদের জাহাজ থেকে পালানোর প্রয়োজন হতে পারে। অতএব আতিকা যেন সব সময়েই প্রস্তুত থাকে। টার্জানের ইঙ্গিত পেলেই সে প্রয়োজন বোধে সমুদ্রের বুকেও ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অবসর মতো টার্জান জাহাজের অন্ধিসন্ধি খুঁজে দেখে। কখন্ কোন্‌দিক দিয়ে যে পালাতে হবে তার কিছুই ঠিক নেই। কাজেই সবদিক দেখে শুনে নেওয়া দরকার—এই ভেবেই সে জাহাজের সবদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চললো।

যখন ঘুরতে ভালো লাগে না, তখন সে চালকের ঘরে গিয়ে তার কাছে বসে থাকে। সে তাকিয়ে থাকে যন্ত্রপাতির দিকে, দেখে চালকের কাজকর্ম। চালক বেচারা লোকটি ভালো, কিন্তু দলে পড়ে ফার্ডিনাণ্ডের জাহাজ চালাতে বাধ্য হয়েছে। এসব খুনখারাবি তার ভালো লাগে না। টার্জানকে তার কাছে বসে থাকতে দেখলেই সে তাকে তার কাজকর্ম বুঝিয়ে দেয়। কী ভাবে জাহাজ চালাতে হয়, কী ভাবে থামাতে হয়, কী ভাবে গতি বাড়াতে হয়, কমাতে হয়—খুব আগ্রহের সঙ্গে টার্জানকে সব বুঝিয়ে দেয়। বেচারা চালক এঞ্জিনিয়ার মানুষ,—টার্জানের মতো মনোযোগী ছাত্র পেয়ে প্রাণভরে তাকে কাজ শেখায়।

ফার্ডিনাণ্ড অস্থির হয়ে উঠেছে। সে যে খবর পেয়েছিল সে খবর সত্য হলে এতদিনে তাদের সেই বাণিজ্য-জাহাজের সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার কোন পাত্তাই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ফার্ডিনাণ্ড তাই অস্থির।

কিন্তু ভগবান্ ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি সুপ্রসন্ন। কারণ যেদিন ফার্ডিনাণ্ড দলের নেতাদের ডেকে বললো যে, যদি বাণিজ্য-জাহাজের দেখা তারা না পায়, তবে সংবাদদাতাকে কেটে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবে, সেইদিনই দূরবীনের সাহায্যে ফার্ডিনাণ্ড অনেক দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলো।

সঙ্গে সঙ্গে দুই জাহাজের মধ্যে সবার কাছে সংবাদ পাঠানো হলো : সবাই তৈরী হয়ে রইলো।

দূরের জাহাজ এসে নিকটবর্তী হলো। দূরবীন কষে ফার্ডিনাণ্ড

দেখলো জাহাজটাকে, কিন্তু দেখে শুনে খুব খুশী হলো না। কারণ এটাকে বাণিজ্য-জাহাজ বলে তার মনে হলো না।

জাহাজ আরও কাছে এগিয়ে এলো। ফার্ডিনাণ্ড স্পষ্টই বুঝতে পারলো, বড় জোর এটা একটা যাত্রী-জাহাজ হতে পারে। এটাকে লুঠপাট করে তারা বড় জোর কিছু খাদ্যসামগ্রী আর টাকাকড়ি পেতে পারে,—কিন্তু এতে ওদের ক্ষুধা মিটবে না।

ফার্ডিনাণ্ড তখন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে তার বাণিজ্য-জাহাজকে ওই যাত্রী-জাহাজের খবরদারি করবার নির্দেশ দিয়ে নিজে মানোয়ারী জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো বাণিজ্য-জাহাজের খোঁজে।

ফার্ডিনাণ্ডের বাণিজ্য-জাহাজ নিশান ওড়ালো—যাত্রা-জাহাজ ভাবলো, ওরা বুঝি কোন সাহায্য চাইছে। তাই যাত্রী জাহাজ আস্তে আস্তে বাণিজ্য-জাহাজের গায়ে ভিড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-জাহাজ থেকে একদল সশস্ত্র দস্যু রাইফেল বাগিয়ে ধরে এসে যাত্রী জাহাজে হানা দিল।—কিন্তু যাত্রী কোথায়!—মাত্র কয়েকজন লোক।

দস্যুরা ভাবলো! ওই কয়টা লোককে নিজেদের জাহাজে নিয়ে এলেই খবরদারি করা সুবিধে। এই ভেবে রাইফেল দেখিয়ে ওদের নিজেদের জাহাজে তুলে নিলো। আর ওই জাহাজটাকেও রাখলো নিজেদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে।

যাত্রী জাহাজের যাত্রীরা ফার্ডিনাণ্ডের জাহাজে উঠে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকতে গিয়ে চমকে ওঠে।

টার্জান মুখে আঙুল দিয়ে বুঝালো, 'চুপ'। চুপ করে গেলেন ক্যাপ্টেন স্মিথ, হান্না আর জুনিয়ার স্মিথ।

নিষ্কৃতি

এটা অবশ্য অবাক্ হবারই কথা। তারা সবাই মনেপ্রাণে কামনা করছিল, তাদের আবার দেখা হোক। কিন্তু তা যে এমন-ভাবে মধ্যসমুদ্রে দস্যুদলের জাহাজে হবে, তা এক মুহূর্ত আগেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সত্যও অনেক সময় কল্পনা অপেক্ষা চমকপ্রদ হয়ে থাকে।

টার্জান তাদের দেখতে পেয়েই চমকে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে নিল। সে বুঝেছিল,—যদি দস্যুরা ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে তারা পূর্বপরিচিত, তাহলে নিশ্চয়ই টার্জানের দশাও হবে যাত্রী-জাহাজের আরোহীদের মতই। তাই সে ইশারায় তাদের নীরব থাকতে বলেছিল।

বিদ্যুৎ চমকের মতই টার্জানের মনে জেগেছিল আর একটি কথা। ক্যাপ্টেনদের রক্ষা করার দায়িত্বও এখন তারই। তা সে যে কী করে সম্ভব হবে তা যথাসময়ে বিবেচনা করা যাবে। আপাতত, যাতে তাদের উপর কোন অত্যাচার করা না হয়, এখন তাকে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফার্ডিনাণ্ডের নিকট টার্জানের খুবই খাতির ছিল—দলের সবাই তা জানে। তাই দলের সকলেই টার্জানকে একটু সমীহ করে চলতো। তাদের সকলেরই ধারণা ছিল, টার্জান হয়তো শীগগির তাদের পক্ষে যোগদান করবে এবং তখন সে যে তাদের সহকারী সর্দার হবে—এ বিষয়েও তারা নিশ্চিত ছিল। তাই বন্দীদের

সম্বন্ধে কি করা হবে, এ বিষয়ে তারা টার্জানের মতামতও জানতে চাইল।

টার্জান দেখলো: এই সুযোগ তার নিকট অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অত্যন্ত বিপদপূর্ণ। কারণ এই সুযোগে সে যদি বন্দীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে চায়, তবে তা দস্যুদলের মনে সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

টার্জান ভাবলো: সে যদি এই সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, তবে হয়তো দস্যুরা বন্দীদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। এই উভয় সংকটে পড়ে টার্জান ভাববার জন্যে একটু সময় চেয়ে নিলো।

ভাবতে টার্জানের খুব বেশী সময় লাগলো না। বিপদে পড়লে টার্জানের মাথা খোলে। জীবনে অসংখ্য বার তাকে বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে, এবং প্রতিবারেই সে উপায় বার করে বিপদের হাত থেকে নিস্তাব পেয়েছে। এবারেও সে চট করে উপায় বার করলো।

টার্জান দস্যুদলের প্রধানদের কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে বললো, "দেখতে এদের যতখানি নিরীহ বলে মনে হচ্ছে, আসলে এরা ততখানি নিরীহ নয় বলেই আমার ধারণা। মনে হয়, বুদ্ধির খেলায় এদের হাবাতে পারলে, এদের কাছ থেকে অনেক ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।—কিন্তু এদের চটিয়ে দিলে এদের কাছ থেকে দু'চারটা গিনির বেশী কিছু পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এখন তোমরা বুঝে দেখো।"

দলের লোকেরা একবাক্যে বললো, "বুদ্ধি-সুদ্ধির ব্যাপারে

আমরা নেই। মারধোর করতে হয়তো বলো—আচ্ছা করে ধোলাই করে দিই। কিন্তু বুদ্ধির মারপ্যাঁচে আমরা পেরে উঠবো না।—ওটা তুমি চেষ্টা করে দেখো।"

টার্জান বললো, "তাহলে আমি ওদের একটু বাজিয়ে দেখবো নাকি?"

ওরা বললো, "হ্যাঁ হ্যাঁ—যা ভালো বোঝো, কর। ওদের ভার আমরা তোমার হাতেই ছেড়ে দিলুম। সোজা কথা—আমাদের সর্দারকে খুশী করতে হবে।"

টার্জানের সঙ্গে দেখা হলো অথচ তার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি—হান্না একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাদের যে কেবিনটায় বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেখানে বসে তারা ফিসফিস করে আলাপ করছে। মনে ভয়—তাই ওরা জোরে কথা বলতে পারেনি। তারা যে দস্যুদলের হাতে পড়েছে,—এ বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু টার্জান কেন তাদের মধ্যে—এই প্রশ্নেরই কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

হান্নার দিকে একটু টেবচা দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মিথ বললো, "কেমন তোমার বীরপুরুষ দেখলে তো? ওর চেহারা, হাবভাব আর কথাবার্তার রকম সকম দেখে আগেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। এখন তো আর কোন সংশয়ই নেই যে এ ব্যাটা দস্যুদের চর হয়েই আমাদের মধ্যে ঢুকেছিল।"

স্মিথের কথার প্রতিবাদ করতেও হান্নার ঘৃণা বোধ হলো।

সে কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ক্যাপ্টেন হান্নার মনের অবস্থা বুঝলেন। তাঁর নিজের মনেও টার্জান সম্বন্ধে স্নেহের ভাব বর্তমান ছিল। তাই স্মিথের কথার প্রতিবাদ করে তিনি বললেন, "ছিঃ স্মিথ! টার্জান সম্বন্ধে এমন ভাবে কথা বলা তোমার অন্যায় হয়েছে। আমরা তার কাছ থেকে উপকার ছাড়া কখনও অপকার পাইনি। তা ছাড়া সে যে এখানে কেমন ভাবে এসেছে, তা আমরা জানিনে। হয়তো আমাদের মতোই বন্দী হয়ে সেও এখানে এসে থাকতে পারে।"

স্মিথ ক্যাপ্টেনের যুক্তি মানলো না। সে বললো, "আপনার যুক্তি আমি মানতে পারিনে এই জন্যে যে টার্জান যদি বন্দী হতো তাহলে এমন ভাবে হেসে খেলে সে বেড়াতে পারতো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—টার্জান নিশ্চয় ডাকাত দলেরই একজন।"

টার্জান এই জাহাজে কেন—এর কোন জবাব হান্নাও খুঁজে পাচ্ছিল না। সে কেবলি ভাবছিলো, কিন্তু সমাধানও সে খুঁজে পায়নি, ভাবনাও তার শেষ হয়নি। শুধু তার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশা—টার্জান যদি ওদেরই একজন হতো, তবে ডাকাতদের অলক্ষ্যে সে অমন ভাবে ইশারা করে তাদের চুপ করে থাকতে বলতো না। অতএব সে নিশ্চয়ই তাদের হিতকামনাই করছে।

তারপর আচমকা টার্জান যখন এসে তাদের কেবিনে ঢুকলো, তখন তারা সবাই চমকে উঠলো। স্মিথ তো রীতিমতই চমকে উঠলো!

টার্জান কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা গেলো ক্যাপ্টেনের কাছে। তাবপব তাকে নিয়ে গেলো কেবিনের এক কোনায়। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে চুপি চুপি কী সব কথা হলো' তাবপব টার্জান সোজা বেবিয়ে গেল কেবিন থেকে,—কাবও দিকে না তাকিয়েই। হান্নাব মুখ কালো হযে গেলো, স্মিথের মুখে হাসি ফুটলো।

টার্জান যে হান্নাব দিকে তাকালো না, তাতে স্মিথ খুব খুশীই হলো, কিন্তু সে ভাবটা মুখে প্রকাশ না করে সে সহানুভূতিব সুবে হান্নাকে বললো, "দেখলে লোকটা কীবকম অভদ্র আব কাঠগোঁযার! তোমাব দিকে তাকালো না পর্যন্ত।"

স্মিথ যখনই টার্জানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেছে, হান্না তখনি তাব প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু এখন আব প্রতিবাদ কবাব কোন পথই বইলো না। আব টার্জানেব এরকম অদ্ভুত ব্যবহাবে সে নিজে যেমন অবাক্ হয়েছিল তেমনি ব্যথিতও হয়েছিল,—তাই সে বললো, "কিন্তু আমাব ধারণা ছিল—"

"তোমাব ধারণার কোন মূল্যই নেই। আমি আগেই যা বলেছি এখনও তাই বলছি,—দেখ আগাগোড়া কেমন মিলে গেছে। আমি ঠিক জানি, এখন যে বাবাব সঙ্গে এসে দেখা করে গেছে তাও নিশ্চয়ই তার স্বার্থের জন্যে। খুব সম্ভব আমাদেব যা কিছু আছে, সব কিছুই তার কেড়ে নেবার মতলব।"

এই বলেই স্মিথ ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো "বাবা, টার্জান আপনার কাছে কেন এসেছিল?"

ক্যাপ্টেনের মুখখানা গম্ভীর। তিনি বললেন, "ব্যাপার খুব সুবিধের নয়। আমরা সাংঘাতিক একটা ডাকাত দলের হাতে পড়েছি। খুব সাবধান থেকো সবাই"

অধীর হয়ে স্মিথ বললো, "সে তো আমরা আগেই বুঝেছি, কিন্তু টার্জান কেন এসেছিল, সে কথা তো বললেন না—নিশ্চয়ই টাকার লোভে?"

মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "হ্যাঁ, ওরা টাকাই চায়। একটা ভালো রকম মুক্তিপণ দিতে না পারলে বোধহয় এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।"

জিজ্ঞেস করলো স্মিথ, "আপনি তাকে কী জবাব দিয়েছেন?"

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, "এখনও কিছু বলিনি, ভাববার জন্যে সময় নিয়েছি। টার্জান আবার আসবে।"

হান্না অকস্মাৎ রুষে উঠে বললো, "না, কক্ষনো নয়। মুক্তি-পণের বিনিময়ে দস্যুদের হাত থেকে আমি রক্ষা পেতে চাইনে। তার চেয়ে বরং আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো, তবু ওদের একটি পয়সাও ছোঁয়াবো না।"

ক্যাপ্টেন হান্নার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করে বললেন, "এমন ছেলেমানুষী কথা বলো না। আগে তো প্রাণে বাঁচি, তারপর পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে।—আমি ভাবছি খুব মোটা পণ দিয়েই আমরা মুক্তি চাইবো।"

স্মিথ জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু টাকা পেলেই যে ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে, তার নিশ্চয়তা কি?"

অবশ্য ক্যাপ্টেন এর কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। তবু

বললেন, "তবু একবার বাঁচবার জন্যে তো চেষ্টা করতে হবে! নইলে মৃত্যু তো সুনিশ্চিত। দেখাই যাক।"

টার্জান পর পর আরও কয়েকবার এলো তাদের কেবিনে।

জাহাজময় চাউর হয়ে গেলো—বন্দীরা মোটা মুক্তিপণ দিতে রাজী হয়েছে।

ব্যবস্থা হয়েছে—দস্যুদলের জাহাজ পইটা বন্দরের খানিকটা দূরে নোঙর করবে। দস্যুদের মধ্যে তিনজন নৌকায় করে যাবে বন্দরে ক্যাপ্টেনের চিঠি নিয়ে। তারপর সেই চিঠি দেখিয়ে টাকা নিয়ে ওরা জাহাজে ফিরে এলে পর জাহাজ আবার সমুদ্রে চলতে থাকবে। তখনই সুবিধামতো একসময় ক্যাপ্টেনকে তার জাহাজসহ ছেড়ে দেওয়া হবে। শর্ত থাকবে—ক্যাপ্টেন কোনদিন এই দস্যুদলের পিছনে লাগতে পারবে না। যদি তাঁর এইরূপ অভিসন্ধির কথা দস্যুরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়, তবে তাঁদের আর নিষ্কৃতি নেই।

এই শর্তের কথা শুনে স্মিথ বিড়বিড় করতে থাকে—কিন্তু তার মনের ঝাল মনেই মিটাতে হয়। টার্জানের কাছাকাছি অবিশ্যি সে কয়েকবারই এসেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস সে পায়নি। টার্জানও আগা-গোড়াই তাদের প্রতি একটা নীরব উদসীনতার ভাব প্রকাশ করে আসছে।

স্মিথ দুঃসাহসে ভর করে একবার ক্যাপ্টেনের কাছে প্রস্তাব করলো, "যে টাকাটা ওদের মুক্তিপণ বলে দিতে হবে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে,—ও টাকাতো যাবেই, আমাদের প্রাণও যাবে।

এই অবস্থায় আমার তো মনে হয়, ওদের কোন টাকা না দিয়ে বরং অন্যভাবে বাঁচবার চেষ্টা করা উচিত।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, "কোন উপায়ের কথা ভেবেছো কি ?"

ক্যাপ্টেনের চোখের দিকে তাকিয়ে স্মিথ ঘাবড়ে গেল। তবু সে সাহস করে বললো, "ধরুন, টার্জানকে কিছু ঘুষ দিয়ে যদি পাঠানো যায়! আমার তো মনে হয় মুক্তিপণ রূপে যে টাকাটা ওদের দেবার কথা আমরা ভাবছি, তার একটা ছোট অংশও যদি টার্জানকে দেওয়া যায় তাহলে ওই বোধ হয় আমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারে।—ও তো টাকার জন্যেই ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

ক্যাপ্টেন তার কথার কোন জবাব দিলেন না। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মাত্র।—এর পর স্মিথ আর কোন কথা বলতে সাহস পেলো না।

এ কয়দিনে সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটেছে হান্নার মধ্যে। সব সময়েই সে মনমরা হয়ে বসে থাকে। তাকে আনন্দ দানের জন্যে স্মিথের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।—ক্যাপ্টেন বুঝতে পারেন তার মনের কথা, কিন্তু কোন কথাই বলেন না।

একদিন দস্যুদের জাহাজ এসে থামলো পইটা বন্দর থেকে খানিকটা দূরে। এইবার ক্যাপ্টেনের চিঠি নিয়ে তিনজন দস্যু রওনা হবে শহরে—তাই নৌকা নামানো হয়েছে জলে।

টার্জান দলের সবাইকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল: শহর কাছে এসে গেছে, শান্তিরক্ষী জাহাজ হামেশাই এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই কোন অস্ত্রশস্ত্র যেন বাইরে না থাকে।

সব অস্ত্রশস্ত্র গোপনঘরে লুকিয়ে ফেলা হলো।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে চিঠিও আদায় করা হলো। এইবার দস্যুদের পাঠিয়ে দেবার আগে টার্জান ডাকলো তাদের সবাইকে স্টংরুমে—এই ঘরেই সাধারণতঃ গোপন সভা বসে থাকে। এ রকম জরুরী সভায় দলপতি থেকে আরম্ভ করে মাঝা-মাল্লা পর্যন্ত জাহাজের সমস্ত লোককেই উপস্থিত থাকতে হয়।—এটা একেবারে আবশ্যিক ব্যাপার।

সভা আরম্ভ হলো—টার্জান সবাইকে উপদেশ দিচ্ছে, এমন সময় মনে হলো, দরজার কাছে যেন পায়ের শব্দ শোনা গেলো। টার্জানের কান খাড়া ছিল—সে শব্দ শুনেই সকলকে একটু চুপ করে থাকবার নির্দেশ দিয়ে চুপিচুপি দরজা খুলে বাইরে এলো।

তারপর অনেকক্ষণ চলে গেলো কিন্তু টার্জান এখনও আসছে না দেখে দস্যুরা উসখুস করতে লাগলো। যে দস্যুরা শহরে যাবে বলে তৈরী হয়েছিল, তারা অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের একজন বাইরে আসবার জন্যে দরজা ধরে টান দিলো—কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

দলপতি চিৎকার করে ডাকলো টার্জানকে, কিন্তু তার কোন সাড়া নেই। দস্যুরা সব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মহা হইচই শুরু হয়ে গেলো। এই গোলমালের মধ্যে তারা শুনলো: একটা জাহাজ স্টার্ট নিচ্ছে। খানিক বাদেই তারা শুনতে পেলো—জল কেটে তাদের পাশ দিয়েই একটা জাহাজ চলে গেলো।

দস্যুরা আপন ফাঁদে আপনি সব বন্দী হয়ে রইলো।

———

আগ্নেয়গিরির দিকে

হান্নার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে অবশ্যি খুব সময় লাগলো না, কিন্তু সেই সঙ্গে মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো স্মিথের। তার মুখে যেন মেঘ ঘনিয়ে এলো।

আজ টার্জানের মনেও খুব অনন্দ। সাধারণতঃ সে কথা বলে কম, কিন্তু আজ তার মুখেও যেন খই ফুটছে। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে জানাচ্ছে তার সাফল্যের বিবরণ। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করছেন, টার্জান হান্নার সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে তার জবাব দিচ্ছে। আবার হান্নার সঙ্গে বকবক করছে। সবার পিছনে নীরবে চলেছে টার্জানের সর্বক্ষণের সঙ্গী আতিকা। স্মিথও নীরব—তবে তাদের দু'জনের মনোভাবে অনেক পার্থক্য আছে।

ক্যাপ্টেন বললেন টার্জানকে, "শহরে পৌঁছে কয়েকদিন অপেক্ষা করবার পরও যখন তোমার কোন খবর পেলাম না, তখন সত্যি মনে খুব ভাবনা হয়েছিল। তারপর দৈবক্রমে একটা সুযোগও জুটে গেল। সরকার থেকে আমাদের একখানা জাহাজ দেওয়া হলো, আর নির্দেশ দেওয়া হলো—আমরা যেন জাহাজ যোগে ওই পাহাড়ের পিছনের অংশটাও একবার পর্যবেক্ষণ করে আসি।"

টার্জান বললো, "কিন্তু পিছনের দিক্ দিয়ে জাহাজ ভিড়োনোর তো কোন জায়গাই পাবেন না। সারা পাহাড়ে একমাত্র ওই গর্তমুখটা ছাড়া আর কোন জায়গায় পা রাখবারই জায়গা নেই।"

ক্যাপ্টেন বললেন, "সে কথা অবিশ্যি আমাদের জানা নেই।

যাহোক, আমরা এই সুযোগে ভাবলুম যে পাহাড়ও দেখা হবে আর তোমাদেরও খোঁজা হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা লোকজন বেশী না নিয়েই জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তার পরের কাহিনী তো তোমাদের জানাই আছে।”

হান্না হেসে বললো, “সত্যি টার্জান, তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার যা মনে হচ্ছিল! আর ক্যাপ্টেনও তেমনি—কিছুতেই তো আমাদের কাছে খবরটা ভাঙলেন না! আমাদের জানতেই দিলেন না যে টার্জান আমাদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করছে।”

হেসে বললেন ক্যাপ্টেন, “গোপন খবর কখনও ত্ু'কানের বেশী তিন কানে তুলতে নেই। যদি কোন রকমে টার্জানের এই অভিসন্ধির কথা ওরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো, তাহলে আর আমাদের রক্ষার কোন পথই থাকতো না।—দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্যটি বুঝেছি যে, যা গোপন তা গোপনেই রাখতে হয়।”

ক্রমে এঁরা এসে তাঁদের ক্যাম্পে পৌছুলেন। অভিযাত্রীদলের যারা টার্জানকে চিনতো, তারা সব টার্জান আর আতিকাকে ফিরে আসতে দেখে পবম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালো।

তারা সবাই ভেবেছিল যে ক্যাপ্টেনই বুঝি পাহাড়ে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে এনেছেন,—কিন্তু যখন তারা শুনলো যে টার্জানই ক্যাপ্টেনকে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, তখন তারা যেমন খুশী হলো, তেমনি বিস্মিতও হলো।

আবার সবাই মিলিত হবার ফলে তাদের কারও মনে আর
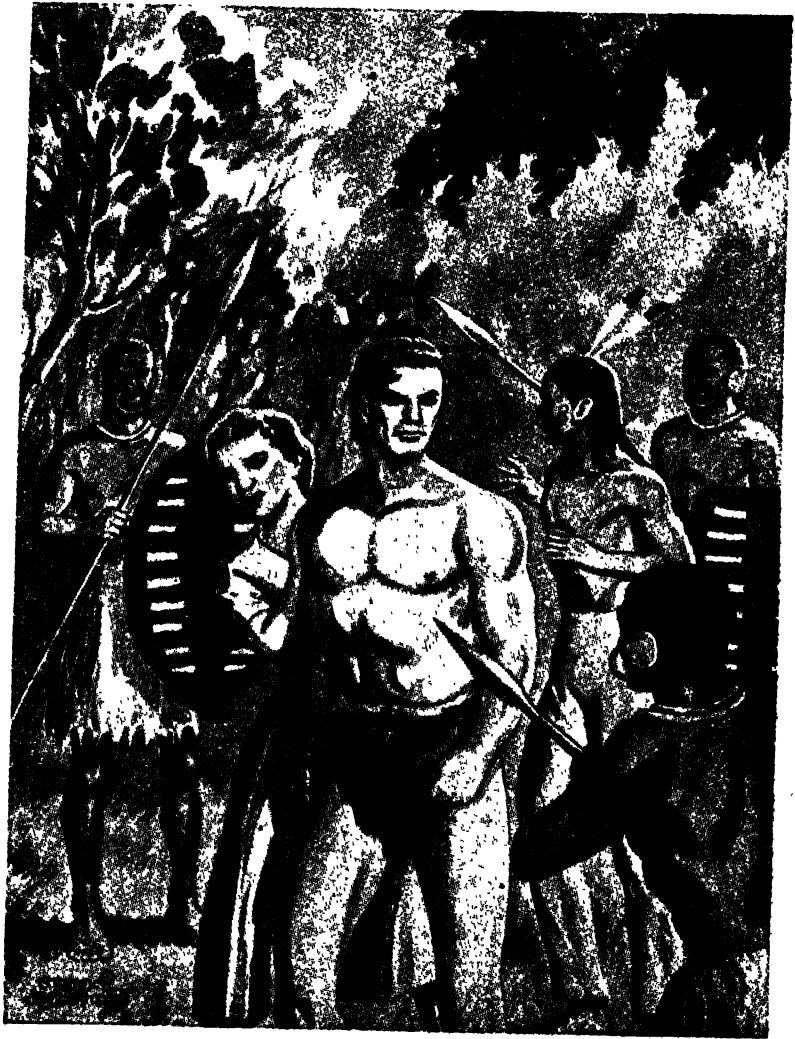
আচমকা এসে বুনোর দল ঘিরে ফেলল টার্জানকে

কোনও উদ্বেগ বা সংশয় রইলো না। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন, শীগগিরই অভিযাত্রীদেরকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।—এবারকার অভিযান হবে আরও ভীষণ আরও সাংঘাতিক। এবার তাদের যেতে হবে আগ্নেয়গিরির দিকে। আগ্নেয়গিরির লাভা এবং গলিত ধাতুপিণ্ড সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালাতে হবে।

ক্যাপ্টেনের ঘোষণায় আবার সবাই ভাবনায় পড়লো কারণ, এই অভিযানের ফলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তাদের যতখানি, মৃত্যুর আশঙ্কা তার চেয়ে ঢের বেশী।

তবু এদের মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেলো, যারা ক্যাপ্টেনের প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিল। তাদের মধ্যে হান্না, টার্জান আর আতিকাও ছিল। স্মিথ হাঁ, কিংবা না, কিছুই বললো না। সে গুম্ হয়ে রইলো।

ক্যাপ্টেন আবার আদেশ দিলেন, "এ কয়দিন আর কোন কাজ নয়, শুধুই আমোদ-আহ্লাদ আর হইচই। তাদের অভিযান আরম্ভ হবার আগে কয়দিন হাসিতে খুশীতে আনন্দে কাটিয়ে প্রাণশক্তিকে বাড়িয়ে নিতে হবে।"

এ আদেশ পেয়ে শিবিরবাসীরা খুব খুশী।

হান্না বায়না ধরলো, একদিন তারা বনভোজনে যাবে। বন থেকেই তারা খাবার যোগাড় করবে, কাঠকুটো কুড়োবে, জলের সন্ধান করবে—যদি সুবিধেমতো পাওয়া যায় তবে শিকারও করবে।

হান্নার এ প্রস্তাবে সবাই রাজী, বেঁকে বসলো শুধু স্মিথ—সে

যাবে না, কিছুতেই সে বনভোজনে যাবে না! সে থাকবে শিবিরে।

ক্যাপ্টেন বললেন যে, যে-বনেব মাঝখানে তাঁরা বনভোজন করবেন, তিনি নিজে কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা কববেন—আর সকলে জিনিসপত্র যোগাড় করতে যাবে।

কয়েকটা দল ঠিক হল। এক একটা দল যাত্রা করবে এক এক দিকে। কেউ নেবে জলের ভার, কেউ নেবে ফলেব ভার, কেউ বা শিকারের ভার নেবেন।

টার্জান, আতিকা আর হান্না নিলো জলের ভার।

কয়েকজন শিবিররক্ষী আর স্মিথকে শিবিরে রেখে ক্যাপ্টেন এবার সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন।

পথে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন হান্নাকে বললেন, "স্মিথের কি হয়েছে বল দেখি! ডাকাতদলের হাত থেকে রক্ষে পেয়ে ফিরে আসার পর থেকেই ওর মুখে কোন হাসি নেই। কেবলি বসে যেন কী ভাবছে, আর বাইবে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

আতিকা বললো, "আমি তাকে একদিন দেখলুম, শহর থেকে অনেকদূরে একেবারে বুনোদের গাঁয়ের ধাবে গাছতলায় একলাটি বসে আছে। আমি ডাকলুম—কিন্তু সে সাড়াও দিলো না।"

সহানুভূতির সুরে হান্না বললো, "কী জানি, বেচারা কেন যেন ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে! দেখি, বনভোজন থেকে ফিরে এসে ওকে কিছুটা চাঙ্গা করতে পারি কিনা!"

টার্জান কিছু বললো না—হান্নার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলো। সবাই বনের মাঝখানে পৌঁছে তারপর ভাগাভাগি হয়ে গেলো।

টার্জান বললো, "বনময় এলোপাতাড়ি ঘুরে এখন আর লাভ নেই। চলো আগে ওই পাহাড়টার দিকে যাই—ওখান থেকে জল নিয়ে এসে তারপর ঘোরাঘুরি করা যাবেখন।"

তারা পাহাড় লক্ষ্য করে চলতে লাগলো।

টার্জানের জীবনের বৃহত্তর অংশই সে কাটিয়েছে বনে জঙ্গলে আর পাহাড়ে। সেও যে এমন একটা সাংঘাতিক ভুল করে বসবে, কে জানতো! পাহাড় যে এতটা দূর হবে, হান্নার অবশ্যি সে ধারণা ছিল না—কিন্তু টার্জানের তো তা না জানবার কথা নয়!

এতদূর থেকে জল নিয়ে গিয়ে যে বনভোজন হয় না—সে কথা দলের কারোরই মনে হয়নি। যদি হতো, তবে হয়তো পাহাড়ের কাছেই তারা বনভোজনের ব্যবস্থা করতো।

হান্না বললো, "টার্জান এ তো দেখছি ভালো বিপদে পড়েছি। পাহাড়ে যেতে যেতেই তো দুপুর গড়িয়ে যাবে—খাওয়া হবে কখন?"

এমন সময় তারা দূর থেকে শুনতে পেলো বন্দুকের শব্দ। শুনে টার্জান বললো, "ওরা সবাই ফিরে গিয়েছে। বন্দুকের শব্দ করে আমাদেরও ফিরতে বলা হলো। কিন্তু ওরা জানে না যে আমরা এখনও পাহাড়ের অর্ধেক পথও যাইনি।"

উদ্বিগ্ন হয়ে হান্না জিজ্ঞেস করলো, "তা হলে উপায়?"

হেসে বললো টার্জান, "উপায় আর কি?—যে উদ্দেশ্য নিয়ে টার্জান বেরোয়, তা সিদ্ধ না হাওয়া পর্যন্ত সে ফেরে না। অতএব চল—পাহাড়ের দিকেই।"

দুর্দৈব যা ঘটলো, তা একেবারেই আকস্মিক। এমন আচমকা এসে যে বুনোর দল তাদের ঘিরে ফেলবে, টার্জান তা কল্পনাও করতে পারেনি। ফলে সে আত্মরক্ষারও ব্যবস্থা করতে পারলো না।

তবু বলতে হয়, ভাগ্য সহায়—আতিকা সঙ্গে ছিল বলেই তারা রক্ষা পেয়ে গেলো। বুনোরা যখন তাদেব গাঁয়ে ধরে নিয়ে গেলো, তখনই দেখা গেলো, গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গেই আতিকার রয়ে গেছে আত্মীয়তা।

বন্ধন মুক্তি অবশ্যি তাদের অচিরেই ঘটলো—কিন্তু একেবারে মুক্তি তারা তখনই পেলো না; আতিকার সম্মানে গাঁয়ে ভোজ হবে, ওই ভোজ না খেয়ে তারা কেউ যেতে পারবে না।

হান্না ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে—ক্যাপ্টেন তাদের জন্যে নিশ্চয়ই ভাবছেন; কাজেই যত শীগগির সম্ভব, তাদের ফিরে যাওয়া দরকার।

কিন্তু বুনোরা এত কার্যকারণ সম্বন্ধে বোঝে না, এত ভাবনা-চিন্তাও করে না। তাই ক্যাপ্টেনের ভাবনা, কিংবা হান্নার উদ্বেগে তাদের কিছু যায় আসে না। তারা তাদের অতিথির যথাযোগ্য মর্যাদা না দেখিয়ে ছাড়বে না।

অতএব সন্ধ্যা পর্যন্ত টার্জানদের সবাইকে বুনোদের গাঁয়েই থাকতে হলো। তারপর ওদের ভোজ শেষ হলে বুনোরাই দল বেঁধে ওদের এনে পৌঁছে দিয়ে গেলো শহরের প্রান্ত পর্যন্ত।

টার্জান হান্না, আতিকা আর কালো মিশমিশে এক বুনোকে নিয়ে যখন শিবিরে পৌঁছালো তখন দেখলো সেখানে হুলুস্থূল পড়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন বনের মধ্যে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন টার্জানদেব আর সন্ধান পেলেন না, তখন তিনি সদলবলে ফিরে এলেন শিবিরে। মনে উদ্বেগ থাকলেও তাঁর ভরসা ছিল যে, টার্জান যখন হান্নার সঙ্গে আছে, তখন তেমন ভাবনার কিছু নেই। যা করেই হোক, যেকোন বিপদ থেকেই টার্জান উদ্ধার পাবে টার্জানের কার্যকলাপ দেখে তার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন এই ধারণাই করেছিলেন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন শিবিরে এসে যখন শুনলেন যে তাঁদের বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্মিথও বেরিয়ে গেছে কাউকে কিছু না বলে, আর এখনও সে ফিরে আসেনি, তখনই তিনি প্রমাদ গুণলেন। তাঁর আশঙ্কা হলো—স্মিথ নিশ্চয় সাংঘাতিক কোন বিপদের মুখে পড়েছে। এখন রাতের অন্ধকারে তাকে খুঁজে বার করাও সম্ভব নয়। তাই এই নিয়েই শিবিরে কোলাহল চলছিল।

টার্জান এসে শিবিরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন কপাল চাপড়ে বললেন, "স্মিথকে পাওয়া যাচ্ছে না টার্জান, আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো।"

টার্জান যে মিশকালো বুনোটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তাকে ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "দেখুন তো ক্যাপ্টেন! এই বুনোটিকে চিনতে পারেন কিনা?"

বুনোটি মাথা নুয়ে ছিলো, ক্যাপ্টেন তার মুখখানা উপরের দিকে তুলে ধরে এক নজর তাকালেন, তারপর নিজের মুখখানা নীচু করে সরে গেলেন—তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না।

এইবার টার্জান হেসে উঠে বললে, "কি স্মিথ—ওই ভাবেই

থাকবে নাকি ? যাবে নাকি আবার বুনোদের সঙ্গে সাঁট করতে তাদের গাঁয়ে ফিরে ?"

শিবিরবাসীরা এতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপার কি তা বুঝতে না পেরে চুপ করেই ছিল, কিন্তু টার্জানের কথা শুনে তারা বুঝতে পারলো যে স্মিথই কালিঝুলি মেখে বুনো সেজেছিল। -তারা সবাই হোহো করে হেসে উঠলো।

এইবার টার্জান ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললে, "ক্যাপ্টেন! স্মিথের অপরাধের জন্যে তার পক্ষ থেকে আমিই আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ঈর্ষার জ্বালায় ও বেচারা বুনো সেজে বুনোদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের নাকাল করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার ফল সে ভালোই ভোগ করেছে। ওকে আর কিছু বলবেন না। আপনি ওকে ক্ষমা করুন।"

টার্জানের সাত্ত্বিকতা দেখে ক্যাপ্টেন আর কিছু বললেন না; শুধু স্মিথকে ডেকে বললেন, "যা হতভাগা—কালিঝুলি ধুয়ে আয়।'

এইবার শিবির গুটানোর পালা—অবিশ্যি শিবির একেবারে তুলে দেওয়া হবে না, এখানে জনকয় লোক থাকছে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্যে। আর বাদবাকী প্রায় সবাই যাবে অভিযানে।

দীর্ঘদিনের পথ—কখনও গাড়ি চেপে, কখনও পায়ে হেঁটে অভিযাত্রী-দল আগ্নেয়গিরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে তাদের অপরিসীম উৎসাহ যদি তাদের অভিযান সফল হয়, তবে যে শুধু তাদের মানই বাড়বে, তা নয়—জাতীয় সরকারের সম্পদ বাড়বে যথেষ্ট। এই কারণেই সরকার তাদের জন্যে একখানা বেশ বড় বিমানও মঞ্জুর করেছেন।

অভিযাত্রিদলকে পথ দেখাচ্ছে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দিচ্ছে ওই বিমান।

একদিন একটা বিরাট ভোজের মধ্যে ক্যাপ্টেন জানালেন যে, তাঁরা প্রায় এসে পৌঁছে গেছেন যথাস্থানে। তিনি দূরবীনের সাহায্যে সেই পাহাড়ের চূড়া দেখতেও পেয়েছেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন।

পরদিন সকালে সবাই তাকাচ্ছে পশ্চিমের দিকে, সত্যিই তো, ওই তো কালোমতো পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। মেঘের মতো এ তো খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে।

অবাক্ হলেন ক্যাপ্টেন—কাল বিকালে দূরবীন লাগিয়ে তাঁকে যা দেখতে হয়েছে, আজ সকালে তা তিনি খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছেন কেন?

ক্যাপ্টেনের মনে সংশয় জাগলো—ব্যাপার তাঁর বড়ো সুবিধের বলে মনে হলো না। তিনি ওই দিনের মতো যাত্রা স্থগিত রাখার আদেশ দিয়ে পরামর্শ-সভা ডাকলেন।

সবাই গম্ভীর হয়ে বসে ক্যাপ্টেনের কথা শুনছে, এমন সময় দূরে যেন কামান গর্জন করে উঠলো—গুড়ুম, গুড়ুম্।

চমকে উঠে সবাই তাঁবুর বাইরে এসে তাকালো পশ্চিম দিকে—সাদা আকাশ কালো হয়ে গেছে!

তারপরই মনে হলো—মাটীর নীচে যেন একসঙ্গে হাজার কামান গর্জন করে উঠলো—পৃথিবী উঠলো দুলে।

শেষ রক্ষা

জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি। দীর্ঘকাল ছিল সে ঘুমিয়ে,—স্মরণকালের মধ্যে কেউ তাকে কখনও জাগতে দেখেনি সবাই ভেবেছিল, এককালের এই দুর্দান্ত গিরি বুঝি চিরকালের মতই ঘুমিয়ে ছিল,—তাই দুঃসাহসীর দল ভিড় করেছিল তাকে কেন্দ্র করে। অতি লোভীর দল তাই চেষ্টা করেছিল তার বুক থেকে সব ধন ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু একটু ফুঁস করে, একটু গা ঝাড়া দিয়ে টের পাইয়ে দিল সে যে—সে মরেনি এখনও বেঁচে আছে সে। এতদিন সে ঘুমিয়ে ছিল, এইবার জেগেছে সে। অতএব সাবধান!

ক্যাপ্টেন গোড়াতেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভূমিকম্পটা একটা অতি সাধারণ অথচ আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। ওই অনতিদূর আগ্নেয়গিরির সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এর একটা যোগাযোগ আছে। তাই তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন সবাইকে।

হান্না বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল, তাই সেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। টার্জান সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এলেও বিজ্ঞানে সে ছিল প্রায় শিশুর মত। তাই সে ভূমিকম্পের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল, এটা একটা আকস্মিক অথচ সাধারণ ঘটনা মাত্র।

হান্না তাকে বললো, "পাহাড়ের উপরকার ওই কালো মেঘের সঙ্গে আছে ভূমিকম্পের ঘনিষ্ঠ যোগ। পাহাড়ের ওপরে

কালো মেঘের মতো ওটা যা দেখতে পাচ্ছো, তা মোটেই মেঘ নয়—ওটা হচ্ছে ধোঁয়া।"

অবাক্ হলো টার্জান!

"ধোঁয়া! তা কেমন করে হবে? ওখানে তো কোনো কারখানা নেই, তবে এতো ধোঁয়া আসবে কোত্থেকে?"

হান্না তাকে বুঝালো, "আগ্নেয়গিরি খেপে উঠেছে। তার ভিতরে দীর্ঘকাল ধরে যে সব জ্বলন্ত অথচ গলিত ধাতু ইত্যাদি ছিল, তারা সব বেরিয়ে পড়বার জন্যে ছটফট করছে। আগ্নেয়গিরির মধ্যে কোন একটা ফোকরের সন্ধান পেয়েছে তারা—ওই পথেই ধোঁয়া সব বেরিয়ে ওদের পথ দেখাচ্ছে। আর ওদেরই ধাক্কায় পৃথিবী উঠছে দুলে-দুলে "

ক্যাপ্টেন সবাইকে ডেকে বললেন, "এবারকার মত, হয়তো চিরদিনের মতই আমাদের অভিযান স্থগিত রইলো। যদি প্রাণে বাঁচি, যদি সুযোগ পাই তবেই হয়তো আরও একবার এখানে ফিরে আসতে পারি,—নইলে, এই বিদায়ই আমাদের শেষ বিদায়!"

হান্না জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু ক্যাপ্টেন! ফিরেই কি আমরা যেতে পারবো? পাহাড়ের ধোঁয়ার রং যেভাবে পালটে যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, শীগগিরই হয়তো লাভা বেরিয়ে আসবে পাতালপুরী থেকে। যদি বেগ বেশী হয়, তবে হয়তো সেই লাভা এখানেও ছিটকে আসতে পারে। আর যদি ছিটকে নাও আসে, তবু যে গড়িয়ে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

হান্নার কথার যৌক্তিকতা ক্যাপ্টেনও স্বীকার করলেন। তিনি

বললেন, "হ্যাঁ, গড়িয়ে এলেও আমরা মরবো। অতএব এখন আর পালাবারও কোন পথ রইলো না।"

শোঁ-শোঁ-শোঁ—মাথার উপর এসে ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের বিমানখানা বিমান-পরিচালক পাহাড়ের অবস্থা দেখেই আশঙ্কা করেছেন যে বিপদ অবশ্যম্ভাবী তাই তিনি ক্যাপ্টেনের আদেশের প্রতীক্ষায় মাথার উপর এসে টহল দিচ্ছেন

টার্জান বললো, "ক্যাপ্টেন, বিমানকে নামতে নির্দেশ দিন। ওই বিমানে করেই আমাদের পালাতে হবে। এ ছাড়া প্রাণে বাঁচবার দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই"

টার্জানের কথায় ক্যাপ্টেন একবার তাকালেন অভিযাত্রিদলের দিকে। তাদের সংখ্যা আর একবার গুনে দেখে বললেন, "কিন্তু এত লোক আর মালপত্রের জায়গা তো বিমানে হবে না!"

দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালো টার্জান, "নাই বা রইলো সবার জায়গা। যে কয়জন জায়গা পাবে, অন্তত সে কয়জন তো বাঁচতে পাবে। আর মালপত্রের কথা বলছেন?—এদের মায়া ছাড়তেই হবে আমাদের।"

এবার প্রশ্ন তুললো স্মিথ। সে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু কে যাবে আর কে থাকবে, তা ঠিক করবে কে?"

চটে গিয়ে বললো টার্জান, "অন্তত তুমি যে বিমানে জায়গা পাবে না; এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো"

তারপরই ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে টার্জান বললো, "ক্যাপ্টেন, আগে তো বিমানকে নামতে নির্দেশ দিন, পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবেখন।"

ক্যাপ্টেনও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন,—কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করলেন টার্জানের কাছেই। এই বিপদে টার্জান যেভাবে তাঁদের চালাবে, তাঁরা সেই ভাবেই চলবেন।

টার্জানের নির্দেশ মতো ক্যাপ্টেন নিশান ওড়ালেন। মুচকি হেসে স্মিথ জিজ্ঞেস করলো টার্জানকে, "কিন্তু বিমান নামবে কোথায়?"

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো টার্জান, "সে ভাবনা অন্তত তোমার নয়। যার ভাবনা, সেই ভাববেখন!"

অবশ্যি আর সবার মনেও স্মিথের মতোই ভাবনা জেগেছিল ;—এই বিমান নামবে কোথায়? কিন্তু স্মিথ যে উত্তর পেয়েছে, তারপর আর কেউ টার্জানকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলো না।

সবাই তাকিয়ে আছে উপরের দিকে—একবার চাইছে পাহাড়ের দিকে, আর একবার চাইছে বিমানের দিকে।

মাথার উপর বিমান ঘুরছে শোঁ-শোঁ-শোঁ—তারপর আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে নামছে নীচের দিকে। মনে হলো মাইলটাক দূরে বোধ হয় বিমান থেকে কোন ফাঁকা জায়গা দেখতে পাওয়া গেছে। সবাই সেইদিকে ছুটে চললো।

পড়ে রইলো গাড়ি, রইলো তাঁবু, রইলো পড়ে যন্ত্রপাতি আর রসদ-পত্র! প্রাণের মূল্যই সবচেয়ে বেশী, প্রাণ বাঁচলে এসব আবার করে নেওয়া যাবে।

বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে টার্জান বললো, "একসঙ্গে আমরা

সবাই যেতে পারবে না, অন্তত দু'বারের কমে এতগুলো লোককে বিমান বইতে পারবে না। যাঁরা স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করতে রাজী আছেন, তাঁরা পথ ছেড়ে দিন। বিমান আবার ঘুরে আসবে তাঁদের জন্যে। আমিও আছি পরের দলে আর যদি সবাই একসঙ্গে যেতে চান তাহলে আমি বলে রাখছি, আমার খুশিমতো বিমানে লোক বোঝাই করবো। জোর করে কেউ উঠতে চাইলে তাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো বিমানের উপর থেকে —এখন বলুন কে কে থাকতে চাইছেন ”

অনেকেই থাকতে রাজী হলেন। টার্জান চেষ্টা করেছিল, অন্তত ক্যাপ্টেন এবং হান্না যাতে প্রথমবারেই চলে যান। কিন্তু তাঁরা টার্জানকে ফেলে যেতে রাজী হলেন না। ফলে ক্যাপ্টেন, হান্না, স্মিথ, টার্জান, আতিকা এবং আরও কয়জন লোক রয়ে গেলো—আর বাকী সবাই বিমান বোঝাই করে রওনা হলো।

কথা রইলো, বিমান ওদের শহরে পৌঁছে দিয়ে আবার আসবে এখানে—যদি তারা বেঁচে থাকে, তবে এখানেই অপেক্ষা করবে বিমানের জন্য।

দল হালকা হয়ে গেলো। অন্তত কিছু লোক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেলো—এই ভেবে ক্যাপ্টেন একদিকে যেমন স্বস্তি বোধ করছিলেন, অন্য দিকে তেমনি যেন নিঃসঙ্গতা বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হয়তো আর তাঁদের ঘটে উঠবে না।

স্মিথ প্রস্তাব করলো, “মূর্খের মতো এই নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে বসে না থেকে বরং যতখানি সম্ভব এগিয়ে যাওয়াই ভালো।”

ক্যাপ্টেন তাকে বুঝালেন, এখানে অপেক্ষা করলে যেমন তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, তেমনি আছে বাঁচবার ভরসাও। কিন্তু হেঁটে এগুতে গেলে মৃত্যু একেবারে অবধারিত। কারণ পাহাড়ের যে অবস্থা দেখা যায়, তাতে হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে, এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে যতখানিই এগুনো যাক না কেন, বিপদসীমা তাতে নিশ্চয়ই পার হওয়া যাবে না। কিন্তু যদি যথাসময়ে বিমান এসে যায়, তাহলে ভয়-ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে।

ক্যাপ্টেনের কথার যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করলো তবু তারা জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলতে লাগলো।

আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় তাদের দুলিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেলেন। পশ্চিম আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে আকাশে তারার দল ঝিকমিক করতে লাগলো—বনের মধ্যে নেমে এলো অন্ধকার। এখানে সেখানে জোনাকিরা আলো দিচ্ছে—কিন্তু পশ্চিম আকাশ এখনও রাঙা।

ক্যাপ্টেন সবাইকে ডেকে বললেন, "পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই লাল রং কিন্তু সূর্যের রং নয়—সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। আগ্নেয়-গিরি আগুন ঢালছে—ওই রং তারই"

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো টার্জান, "পাহাড় আগুন ঢালছে? তাহলে উপায়?"

নিরুপায় ভাবেই বললেন ক্যাপ্টেন, "উপায় কিছুই নেই—একেবারে অদৃষ্টের উপর ভার দিয়েই বসে থাকতে হবে। দৌড়ে পালানোর কোন পথ নেই।"

জীবনে টার্জান কোনদিন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেনি, সে চিরকালই নিজের পৌরুষের সাহায্যে কাজ করে গেছে। অথচ সেই শক্তি সামর্থ্য আর পৌরুষ বজায় থাকতেও আজ নিরুপায় হয়েই হাত-পা তার গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। তার এক একবার ইচ্ছে হয়—নিজের হাত কামড়ায় সে।..

ক্যাপ্টেন বললেন, "লাভা আর গলিত ধাতু এখনও উৎক্ষিপ্ত হতে শুরু হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ তার আগে পাহাড়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আমার মনে হয়, বিস্ফোরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত। তবে আকাশের রং দেখে মনে হচ্ছে—এই বিস্ফোরণও হয়তো আসন্ন।"

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতে না হতেই পৃথিবী আবার দুলে উঠলো। মাটির নীচে আবার গুড়গুড় শব্দ শোনা গেল।

এই শব্দ আর থামলো না—সারারাত ধরে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগলো। আর থেকে থেকেই পৃথিবী কাঁপতে লাগলো।

টার্জান জিজ্ঞেস করলো, "বারবার এরকম ভূমিকম্প হচ্ছে কেন ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন বললেন, "এ হলো আমাদের প্রতি সতর্কবাণী। এর পরেই একসঙ্গে হবে ভীষণ ভূমিকম্প আর বিস্ফোরণ। এর আগে যদি আমরা এই জায়গা ছাড়তে না পারি, তবে মৃত্যু আমাদের অবধারিত। কোন দৈব ঘটনায়ও আর বাঁচবার পথ নেই।"

সারারাত কারও ঘুম হলো না—কেবল আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইল সবাই! রং ক্রমশ গাঢ় লাল হয়ে উঠতে

লাগলো। দূর থেকে দেখে মনে হয়, যেন পাহাড়ের চূড়ায় আগুন ধরে গেছে।

পৃথিবীও থেকে থেকে কাঁপতে লাগলো—গুড়গুড় শব্দের আর বিরাম নেই। এই ভাবেই তারা যখন সারারাত জেগে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো, তখনই মাথার উপর শোঁশোঁ শব্দ শুনে আবার হকচকিয়ে উঠে বসলো তারা একসঙ্গেই।

বিমান এসে গেছে।

ওদিকের পাহাড়ের ধোঁয়া এদিকে এসে গেছে—বাতাসে গন্ধকের গন্ধ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

পৃথিবীর কম্পন আরও দ্রুত, আরও ভীষণ হয়ে উঠেছে!

তাদের মাথার উপর খানিকক্ষণ বোঁবোঁ করে ঘুরে অবশেষে বিমানটা আস্তে আস্তে নেমে এলো নীচে। তারা সব তাড়াহুড়া করে ছুটে গেলো বিমানের দিকে।

ক্যাপ্টেন, হান্না, স্মিথ আর যারা ছিলো একে একে তাদের সবাইকে বিমানে তুলে দিয়ে সব শেষে টার্জানও এসে দাঁড়ালো সিঁড়ির মাথায়।

সকলে মিলে শেষবারের মতো তাকালো সেই অরণ্যের দিকে। তারা তাকালো সেই পাহাড়ের দিকে— পাহাড়ের চূড়া যেন আগুনের মতো লাল হয়ে গেছে!

বিমানের সিঁড়ি তোলা হলো—খানিকটা মাটির উপর গড়িয়ে গিয়ে বিমান উপরের দিকে উঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ। দু'হাতে সবাই কান চেপে ধরে পাহাড়ের দিকে তাকালো।

সবিস্ময়ে তারা দেখলো :

পাহাড়ের চূড়োটা টুকরো টুকরো হয়ে আকাশে উঠে চারদিকে ছ ড়য়ে পড়লো, আর পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো গলিত ধাতু আর নানাবকমের গ্যাস।

হান্না ভয়ে আব সেদিকে তাকাতে পারেনি—সে রইলো নীচের দিকে তাকিয়ে। চিৎকার করে সে টার্জানকে বললো, "টার্জান, দেখ দেখ!"

সবিস্ময়ে সকলে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো : তারা .য জায়গাটায় ছিল,—ভূমিকম্পে সেখানটায় এক বিবাট খাদেব সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে তারা বিমানে চড়তে না পারলে, এই খাদেই রচিত হতো তাদেব জীবন্ত সমাধি।

ক্যাপ্টেন বললেন, "দয়ামষ ভগবানের দয়ায় এবারকার মতো নিষ্কৃতি পেয়েছি। আর ভগবানের দয়াতেই এখান থেকে যে গলিত ধাতু আর লাভা নির্গত হয়েছে, আমাদের ভবিষ্যতের গবেষণার পক্ষে তা হলো অতি উত্তম। ভগবান যা কিছু করেন, মঙ্গলের জন্যেই।"

টার্জান আত্মগত ভাবেই বললো, "জগতে কত দেখেছি, কিন্তু আবও কতই না রয়ে গেছে বাকী!"

—শেষ—